অশ্বযোনি

অশ্বযোনি

বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ · শ্রাবণ ১৩৫৭
২০তম মুদ্রণ : কার্তিক ১৪০৮, সংখ্যা ২২০০
২১তম মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১০, সংখ্যা ২২০০
২২তম মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১২, সংখ্যা ১১০০
২৩তম মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৬, সংখ্যা ১১০০
২৪তম মুদ্রণ : মার্চ ২০০৮, সংখ্যা ২২০০

প্রকাশক ঃ
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ প্রণবেশ মাইতি .

মুদ্রাকর ঃ
তনুশ্রী প্রিণ্টার্স
২১বি, রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

অ শ্ব যো নি



যখন বাড়ি ফিরছিলুম আমি একা হলেও একা ছিলুম না। আমার সঙ্গে ছিল চোখের ও শরীরের ভঙ্গি সব, শিল্প যাদের স্থির করে দিয়েছে, কিন্তু তাদের জঙ্গম জীবনময় চরিত্রকে পাল্টাতে পারেনি। জঙ্গমকে ধরতে পারাই বোধহয় শিল্পের কঠিনতম সাধনা। সুতরাং আমি বাঁকুড়াময় হয়ে ফিরছিলুম। দক্ষিণ কলকাতার যে প্রান্তিক আবাসনের দশতলায় আমার বসবাস, সেখানে জানলা দিয়ে অবারিত আকাশ ঢোকে, হাওয়া এবং রোদ ঢোকে। প্রত্যেককে আমি অঞ্জলি করে তুলে নিই, মাখিয়ে নিই আমার সর্বাঙ্গে, আমার বাসস্থানের সর্বশরীরে। এখন মাখবার, মাখাবার একটা নতুন জিনিস হল।

মেজাজে ওপরে উঠে যাই, লিফটের মধ্যে কে আমার জন্যে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ ফেলে গেছে। চারিদিকে একটা অনুকূল বায়ু বইছে। ব্যাপারখানা কী? এ রকম একটা ইউফোরিয়ার তুঙ্গে তুলে দিচ্ছো কেন হে? তুমি ভুলো না রাজেশ্বরী, নিজেকে কোনো ভুলভুলাইয়ায় হারিও না, মাটির ওপর দাঁড়িয়ে চলো। জানি কানের দু-পাশ দিয়ে ঝড়ের মতো হাওয়া পেছন দিকে বইতে থাকলে তোমার দারুণ লাগে। জানি তুমি নতুন, নতুনতর, কিম্বা পুরোনোকেও নবীকৃত দেখতে দেখতে তর হয়ে যাও। তোমার এইসব আত্মিক পাগলামি একটু থামাও দেখি। এখন সামনে দরজা, হাতলে সামান্য চাপ দিলেই খুলে যাবে। এখন কি সে বাড়ি আছে? তোমার একমাত্র বন্ধন, একমেব রক্তসম্পর্ক?

ভেতরে ঢুকে দরজাটা চেপে দিই। সামনে খোলা বারান্দায় হাসি-রোদ খেলছে, ডানদিকে টি ভি-সোফার ওপর জেগে আছে তার চুল ওপচানো কিশোর মাথা। পূর্ণ চোখে তাকাই সে দিকে—উৎসুক, উন্মুখ।

—লালদা ফোন করেছিল, বাবুই টিভি-তে চোখ রেখে বলল।

ওর প্রিয় কিছু হচ্ছে হিস্টরি চ্যানেলে। ইজিপ্টের মৃত্যুর দেবতা শেয়ালমুখো আনুবিসকে দেখতে পাচ্ছি।

আমাব হাতের ব্যাগে বাঁকুড়ার লাল ধুলো, রাঙামাটি রঙের খাদির পাঞ্জাবি, আরও রেঙে গেছে, যদিও বোঝা শক্ত। স্টোন ওয়শ ছিল জিনসটা সেটা অবশ্যই এখন পোড়ামাটি ওয়শ হয়ে গেছে। বাবুই ফিরে তাকালে দেখতে পেত বিষ্ণুপুরের মন্দির থেকে কোনও রাঙাভাঙা মূর্তি মন্দিরের প্লাস্টার সমেত উঠে এসে ওর পেছনে দাঁড়িয়েছে! ইজিপ্টপ্রেমিক পুত্র হয়তো মাকে পুরাতাত্ত্বিকে পরিবর্তিত হতে দেখে ভূত দেখত।

—কাকে?

—কাকে আবার, তোমাকে! —বাবুই কেন অবাক হল আমি জানি না। কেননা লালদার সঙ্গে বাবুইয়ের সম্পর্ক যা আছে তা ওর কাজিন ফুলটুসের মাধ্যমে। ফুলটুস বাবুইকে ফোন-টোন করে। কাজিনে কাজিনে ওদের মধ্যে একটা চোরা টান কাজ করে যায় কিন্তু গত আট বছর লালদাকে আমি চোখে দেখিনি, কানে শুনিনি। কোনও যোগাযোগ নেই আমাদের। খুব যে দূরত্ব তা নয়, ও খড়দায়, আমি কসবায়। ইচ্ছে করলে আমি যেতেই পারি, ও যদি অফিস ও বয়সের কারণে আসতে না-ও পারে। কিন্তু ইচ্ছে করেনি। হঠাৎ কী এমন ঘটল যে লালদা আমাকে ফোন কাব ফেলল? যাক, যদি সত্যিসত্যি দরকার থাকে তাহলে আবার ফোন করবে এখন, আমার এখন মন চাইছে না। আমি বাথরুমে ঢুকে যাই। প্রথমে ধুলোঝাড়া পর্ব, তারপর দোলের রং তোলার মতো লালমাটির রং তোলা, ঘষে ঘষে রগড়ে, চুলে শ্যাম্পু, গোড়ালিতে ঝামা, তারপর ধারাস্নান, অনর্গল অবিরল, শ্রাবণধারাপাতে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বৃষ্টিফোঁটার আঘাত নেওয়া। আজু কী আনন্দ, আজু কী আনন্দ!

শ্যামরায়ের মন্দিরটার ওপরই আমার মুখ্য কাজটা হবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এসেছি সবগুলো মন্দির। মদনমোহন মুরলীমোহন, জোড়বাংলা, রাধেশ্যাম, সব

সব। ঝুলত ঝুলনে শ্যামরচন্দ — ভেতরে গান বাজতে থাকে। উচ্চস্বরে গেয়ে উঠি, ধারাপাতের সঙ্গে মিশে যায় আনন্দসংগীত। কী নাম দেব— টেরাকোটা, না নবনারীকুঞ্জর? সুদেবদা সবসময়ে বলেন—শিরোনামটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, সঙ্গে সঙ্গে যেন টেনে নেয় পাঠককে। আমি নিজে পাঠকের কথা ভেবে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে চাই না। কিন্তু ওঁরা অনেক অভিজ্ঞ, আমার দৃষ্টিভঙ্গিটাও বোঝেন, আবার ওই পাঠক, বাজার এসব নিয়েও ভাবনা-চিন্তা করা ছাড়েন না। এখন, আমি আমার মতে প্রতিষ্ঠিত থাকব কি না সেটা তো শেষ পর্যন্ত আমারই ব্যাপার! চুলে প্রথম তোয়ালেটা জড়িয়ে নিয়েছি, দ্বিতীয় তোয়ালে দিয়ে আচ্ছা করে মুছছি গা, দরজায় ঘা পড়ল—মা তোমার ফোওওন।

—বল এক মিনিট ধরতে। —আমি চটপট ঝোল্লামতো হাউজ কোটটা গলিয়ে নিই। দরজা খুলে বেরোতেই কর্ডলেসটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে যায় বাবুই, ওর ভুরু কুঁচকে আছে। ও কোনও কাজের মাঝখানে এ ধরনের হাইফেন পছন্দ করে না। এখনও কি জানে না পৃথিবী ওর ভালো লাগা না-লাগার তোয়াক্কা করবে না! ওর মাও এখন করছে, কিন্তু চিরকাল করবে নাকি?

—বলুন, আমি বিরক্তি গোপন করে বলি।

—খুকু আমি দুলদা বলছি। —বিস্ময়ে রিসিভারটা আমার হাত থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। দুলদা তো অসমে থাকে। ডিব্রুগড়ে ম্যাকেনজি অ্যান্ড শাইকিয়াদের চা বাগানে কাজ করে। কত কতকাল ওর গলা শুনিনি। ভুলেই গিয়েছিলাম ও আছে। কোথা থেকে করছে কিপটেটা?

—আমি তারকেশ্বরে এসেছি। —যেন আমার না বলা প্রশ্নের জবাব দিতেই দুলদা বলল—বড়দা তোকে ফোন করেনি?

—করেছিল শুনেছি, তখন এখানে ছিলুম না। কেন?

দুলদা বলল— রাগ করছিস নাকি?

এ কথার কোনও উত্তর দেওয়া বাহুল্য। দুলদা বলল— আমাদের একটু মিট করা দরকার। একটা খুব সমস্যা হয়েছে। সবাই মিলে ছাড়া সে জট ছাড়ানো যাবে না। আমি আর চার দিন আছি, এর মধ্যেই দিনটা ঠিক করতে হবে, ধর পরশু!

—লালদা কি এইজন্যেই ফোন করেছিল?

—হ্যাঁ।

—ব্যাপারটা কী? আমি তো তোমাদের ব্যাপারে থাকা অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি!

—আয়, তারপর বলব, তুই ছাড়া হবে না। এটা একটা সনির্বন্ধ রিকোয়েস্ট।

সনির্বন্ধ রিকোয়েস্ট? আরও কত ভাষাই যে শুনব! আ মরি বাংলা ভাষা! মা আমার, সকল বিষ হজম করে তুমিও তো নীলকণ্ঠ! কেউ যে সে কথা বলে না—এ-ও এক আশ্চর্য!

পরবর্তী দেড় ঘণ্টার মধ্যে আরও দুটো ফোন এল, নীলদা, বিলদি। সকলেই আমাকে 'সনির্বন্ধ রিকোয়েস্ট' করছে লালদার খড়দহর বাড়িতে যেতে, সেখানেই সবাই আসবে, জমায়েত হবে। কতটা সময় লাগবে কেউ জানে না, সুতরাং সারা দিনের প্রোগ্রাম, বাবুইকে নিয়েই যেন যাই।

খেয়াল করে দেখলুম দিনটা শনিবার, বাবুইয়ের হাফ ডে, কিন্তু তার পরেও ওর অঙ্কের স্যারের কাছে যাওয়ার আছে। ঠিক করলুম ওকে মোটেই নিয়ে যাব না, এই গোঁসাই গোষ্ঠী কী চায়, কেমন করে চায়, কী ভাষা ব্যবহার করে সে সম্পর্কে আমার ধারণা খুব গোলমেলে। এর মধ্যে আমি ছেলেকে জড়াব না। বাবুইয়ের একা থাকা অভ্যাস আছে। কোথাও থেকে একটা রোলটোল খেয়ে নেবে, স্যারের কাছে পড়া সারবে। তারপর বাড়ি এসে চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঢুকবে, চান করবে, টাটকা জামাকাপড় পরে এক কাপ চা করে মুড়ি দিয়ে খেয়ে নেবে। টি ব্যাগ আছে, পাতা চা-ও আছে, যা ইচ্ছে। যে কোনও কাজে মায়ের পেছন ধরবার অভ্যেস ওকে আমি করাইনি, বা জীবন করাতে দেয়নি। আমার জীবন আমার ছেলের জীবনে এইখানটায় মিল।

ও ভাতে ভাত, ডাল, ছোটখাট একটু মাছের ঝোল—এ-ও করতে পারে। কারও অভাবে কোনওদিন অসুবিধেয় পড়বে না। এইটুকু করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। আমিও যে পাকে প্রকারে এই ধরনের সব কিছু করার, করতে পারার ক্ষমতাটা অর্জন করেছি, হতে পারে অসম্ভব দায়ে পড়ে, তাতে অন্যের যা উপকার হয়েছে হয়েছে, কিন্তু আমার যা হয়েছে তার মূল্য একমাত্র আমিই জানি। পৃথিবীর কোথাও যে কোনও সময়ে, ন্যূনতম উপকরণ দিয়ে আমার চলে যায়, উপকরণ না থাকলেও আমার খুব একটা অসুবিধে হয় না।

দু-একদিন না খেয়ে থাকা বা না ঘুমিয়ে, ওটা আমার কাছে কোনও ব্যাপারই না।

লালদা? লালদার কাছে শেষ গেছি বছর আটেক আগে ভাইফোঁটা দিতে। দুলদা ডিব্রুগড়, নীলদা বিলদির কাছে ভুবনেশ্বরে চলে যায় ভাইফোঁটার আগে, কালীপুজোর আগের দিন, অর্থাৎ ভূতচতুর্দশীর দিন একটা আস্ত ভূতের মতো। নীলদা কেন কে জানে বিলদির ফেভারিট। এর মধ্যে অন্য কারও কোনও সিন নেই। তাই আমি লালদার বাড়ি যেতুম। সেবার মাছের চপ আর মালপোয়া করেছি, দুটোই দাদার প্রিয়, তখনও আমার রান্নায় মতি ছিল, সেনমশায় থেকে কিনেছি ওদের ভাইফোঁটা স্পেশ্যাল খাজা, কুচো নিমকি আমার হাতে ঠিক মায়ের মতো হয়, সেটাও। খড়দায় গিয়ে পৌঁছেছি দাদার অফিস টাইমের আগে, মানে ধরুন আটটা। দাদাটা ধীরে-সুস্থে খাবে তবে তো অফিস যাবে! আমাকে ট্যাকসি নিয়ে বেরোতে হয়েছে সাড়ে ছটায়। এমনিতে আমি বাসে ট্রামেই যাতায়াত করি। সেদিন তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো, টাটকা খাবার দাদার পাতে পৌঁছে দেওয়া, এ রকম আরও নানা কারণ থাকায় ট্যাকসি। দাদাকে খাওয়ালুম, খুব ভালো করে খেল, তবু কীসের যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল দাদা সেটা টের পেয়ে আমিও একটু অস্বস্তিতে ছিলুম। বউদি বলল— লালদার কাছ থেকে তোমারও একটা গিফট পাওনা হয় খুকু। চট করে একটা চকরাবকরা ছাপা শাড়ি নিয়ে এল বউদি। ক্যাঁটকেঁটে সবুজ, তার ওপর ছাপগুলো চাঁদ তারা মার্কা, যেন পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ হতে হতে শাড়ি হয়ে গেছে। আমি ওদের সবার জন্যেই খাবার নিয়ে গিয়েছিলুম। বউদির হাতে দিতে দাদা হঠাৎ একটু তাড়া দিয়ে উঠল —যাও যাও ওগুলো ফ্রিজে রেখে দিয়ে এসো, ফুলটুস বিকেল বেলায় এসে খাবে তো? কাগজের বাকসো থেকে বার করে কাচের বাটিতে রেখো, না হলে গন্ধ হয়ে যাবে।

বউদি বলল —তুমি শেখাচ্ছ আমাকে? হাসালে।

ও চলে যেতেই লালদা আচমকা তড়বড় করে উঠে ওর ট্রাঙ্ক না কী হাতড়ে একটা পাঁচশো টাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিল। ইশারায় বলল তক্ষুনি ব্যাগে পুরে ফেলতে। তা আমি ফেললুম। কিন্তু সেই শেষ। যে সংসারে উপার্জক দাদাকে বউয়ের চক্ষু এড়িয়ে চুপিচুপি মেয়ের বয়সি বোনকে উপহার

দিতে হয়, তার নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয় বলেও কিছু আছে কি না সন্দেহ, সেখানে মানুষটাকে বিব্রত করবার জন্যে কেন মিছে যাব?

লালদা বেসরকারি অফিসে কেরানির চাকরি করত। ভালোই মাইনে, গলায় টাই ঝুলিয়ে যেতে হত, তাতে সম্মানটাও বাড়ত। কিন্তু উপার্জনের বেশিটাই খরচ হত একমাত্র সন্তান ফুলটুসের জন্যে। ফুলটুসকে বাবার মতো কেরানি হলে চলবে না, তাই তার সাহেবি স্কুল, তার স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যবিধি, তার রুটিন ক্রিকেট, সাঁতার, বসে আঁকো, তার কুইজ কনটেস্ট, সব সব সব। সুতরাং মাস মাইনের সবটুকু যে বউদি দাদার পকেট থেকে বাজেয়াপ্ত করে নেবে তাতে আর আশ্চর্য কী! ফ্রিজ-ভর্তি, আলমারি-ভর্তি খালি ফুলটুস আর ফুলটুস। আট বছর পরে দাদার মাইনেও বেড়েছে, পনেরো বছরের ফুলটুসও এখন তেইশ, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কোন না একটা মালদার চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে! ব্যাস আবার কী! উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরাকাষ্ঠা! লালদা এখন হয় তো মুড়ি ছোলাভাজা ছাড়াও অন্য টিফিন খেতে পায়। চুকে গেল।

আমার বড়দি একটা বিশ্রী দুর্ঘটনায় মারা যায়। সন্দেহ করা হয় ওটা শ্বশুরবাড়ি ও জামাইবাবুর কীর্তি। কিন্তু নাইনটি পারসেনট বার্ন নিয়ে যখন দিদি মারা গেল, একবারও তার মুখ থেকে কারও বিরুদ্ধে কোনও কথা বার করা যায়নি। পেটে একটি মেয়ে ছিল, সে-ও মারা যায়। দিদির একমাত্র ছেলে টুকাই তখন পাঁচ বছরের, আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট। দুজনে একসঙ্গে হেসে খেলে বড় হয়েছি। ও মামার বাড়ি থেকে ফিরে যাক এটা ওর বাবারা চায়নি, কারণ তাতে দ্বিতীয় বিয়েটায় অসুবিধে হত। টুকাই এখনও তার দিদাই মানে আমার মায়ের সঙ্গে থাকে। ওর ফ্যামিলিও হয়েছে, কিন্তু আমি ওর বিয়েতে যাইনি, যাইনি ওর মেয়ের অন্নপ্রাশনেও। তাহলে বাকিদের বাড়ির এর বিয়ে ওর পইতে তার মুখে ভাত-এ আমার যাওয়া কতটা অসম্ভব যে কেউ বুঝতে পারবে।

বাবুইয়ের ভুরু এখনও কুঁচকে আছে। কে জানে কেন। আমার ফুল্লতা একটু তো মার খেয়েছেই। এতগুলো ফোন, অজানা সমস্যা, অনিচ্ছার মিটিং...। তবে মার খেলেও পুরোপুরি যায়নি। বাবুইয়ের ভ্রূকুটির রহস্য উদ্ধার করতে পারলেই মুড যেটুকু ঘা খেয়েছে, সামলে নেবে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি দিব্য কইমাছের ঝাল করা রয়েছে, হাঁড়িতে ভাত। ব্যস আর কী চাই? একটা

শশা কেটে নিই, প্লেটে সব গুছিয়ে নিতে নিতে একবার ভাবি বাবুইকে জিগগেস করব ও-ও খাবে কি না, পরক্ষণেই মনে হয় এই যে এটা মায়ের কর্তব্য, ছেলের কর্তব্য নয়—এই মেসেজটা তো আমি ওকে কখনও দিতে চাই না। আমি অত দূর থেকে ধূলিধূসরিত ফিরলুম ও তো একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলও না। কেমন ঘুরলুম, কতটা সংগ্রহ হল, কদিন কী খেয়েছি, এখন খাব কি না—এগুলো যে একজন পুত্রের জিজ্ঞাস্য হতে পারে তার মাতৃদেবীকে এটা ওর মাথায় এল না কেন? বলে বলে না হলেও আমি তো ওকে সেই রকম শিক্ষা দিয়েছি বলেই জানি। কাজের বা কর্তব্যের কোনও ছেলে-মেয়ে নেই, বড় ছোট নেই, সব অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়, সঙ্গীসাথীর খেয়াল রাখতে হয়... এই সব! তাহলে আপনি আচরি ধর্ম এই যে শিক্ষা তার কোনও ফল নেই? এখনই এই যোলো-সতেরো বছর বয়সেই কি ও একখানা মার্কামারা ইন্ডিয়ান ছেলে হয়ে যাচ্ছে। পরিপার্শ্ব পরিস্থিতি শিক্ষা উদাহরণ সমস্ত উপেক্ষা করে? যাক গে যাক, যা বোঝে আপাতত তাই করুক। আমি খাবারটা নিয়ে ওর পেছনে টেবিলে চলে যাই। ইচ্ছে হচ্ছিল একেবারে শোবার ঘরে গিয়ে খাওয়াটা সারি। কিন্তু ওই যে, ভেতরে একটি আত্মার আত্মীয় মাতা বসে আছেন তিনি বোধ হয় একটা ক্ষীণ আশা করছিলেন যে কাছাকাছি থাকলে কিছু ঘটতে পারে। হয় নিজের খাবারটা নিয়ে এসে বসা, নয় বিরক্তির কারণ খুলে বলা, নয় এই সব ফোনাফুনির কারণ জিগগেস করা, নয়...।

তেল-কইটা দারুণ রেঁধেছে তো কবিতা? একদিনই দেখিয়ে দিয়েছিলুম—সা রে সা গা রে, ছোট্ট মুরকি, ভালো তুলেছে। ধনে জিরে বাটা দিয়ে মাছটাকে ভিজিয়ে রাখো, ঘণ্টাখানেক পরে কড়ায় অল্প তেল, শুকনো লংকা আর জিরে ফোড়ন দিয়ে মাছটাকে উলটে পালটে নিয়ে নুন-টুন দিয়ে সামান্য একটু জল, সেদ্ধ হয়ে যেতে বেশি সময় তো লাগবে না! এবার বেশ খানিকটা সরষের তেল ঢেলে নামিয়ে নাও। অনেকে সরষে দিয়ে করে, অযথা রিচ হয়ে যায়, সরষের তেলেই ঝাঁঝটা আসে। যখন হোম ডেলিভারির ব্যবসাটা নতুন ধরেছিলুম, তখন এই তেল-কইয়ের অর্ডারে পাগল হয়ে যাবার দশা হত।



মোনালিসা

কে যেন ডাকল— খুকু! খুকু! আমার ভগ্নাংশিক চেতনায় এই ডাক ক্রমশ বড় আরও বড়, আরও জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। আমি টলটল করে যাচ্ছি, একটু এগোচ্ছি, ধুপ করে পড়ে যাচ্ছি, আবার এগোচ্ছি। ক্রমশ বদলে যায় এই চলন। আমি চলি নাচের ছন্দে বা এক্কা দোক্কার ছন্দে। এক্কা দোক্কা তেক্কা চৌকা জিরেন। চলি ধি ধি না না তি না, ধি ধি না না তি না, ধা ধিন ধিন ধা, ধা ধিন ধিন ধা, না তিন তিন না, তেটে ধিন ধিন ধা। আমি চলাটা দারুণ উপভোগ করি। অত ছোটতে তো কেমন চলছি নিজে বোঝা যায় না, খালি আনন্দটা পাওয়া যায়, তাই চলতে ছুটতে আমার কামাই নেই, কেউ কেউ, মানে এ ও সে হঠাৎ বলে ওঠে— বাঃ মেয়েটা ভারি সুন্দর চলে তো! কেউ বলে— চলে, না নাচে? এ মেয়েকে নাচ শেখালে ভালো হয়। আমি ডাকি—মধ্যমে ডাকি পঞ্চমে ডাকি, এ-ও-সে হঠাৎ বলে ওঠে, কী রকম সুরে গলা দেখো! কালো দেখতে হলে হবে কী, সবার মধ্যে এটিই নিরেস, তবে গান শেখালে ভালো হবে. কিন্তু এই দিশা দিগরে কেউ নেই যে আমাকে দুটি খেতে দেয়। যখন দুধ খেতুম খালি তখন আমার ক্ষীণ ভাবে মনে আছে খুব ফরসা একজন আমাকে চেপে ধরে ঝিনুকে করে দুধ খাইয়ে

দিচ্ছে, সেটা আসলে বড়দি। বড়দি নিশ্চয় সারা বছর দুধ খাওয়াতে থাকতেন না। তাহলে কে আমাকে পুষ্টি জোগাল? সে কি অদৃশ্য কেউ, কোনও পরা শক্তি? এ প্রশ্নটা আমার মাথা থেকে নড়ে না। এখনও। জীব যিনি দ্যান আহারও বোধহয় সত্যিই তিনিই দ্যান, সে যে ভাবেই হোক। আমার আরও মনে পড়ে একটা মস্ত উঁচু টেবিল, তার ওপর থরে থরে খাবার সাজানো রয়েছে, সব ঢাকা দেওয়া। কী করে বুঝলুম? কেননা রান্নার বামনি রেঁধেছে নানারকম, সেটা আমি চলতে চলতে খেয়াল করেছি। ওইখানে সব তুলে রেখেছে, ব্যাস তার ডিউটি শেষ। যে যখন ইচ্ছে যেমন ইচ্ছে নিয়ে খেয়ে নেবে। একজন আছে, একমাত্র একজন যে নিজে নিতে জানে না, পারে না, নাগাল পায় না ওই উঁচু টেবিলের, সেটা তার ভাবনার কথা নয়। সুতরাং আমি টেবিলের পায়া ধরে খালি পাক খাই, তারপর একদিন বহু কষ্টে একটা চেয়ারের ওপর উঠে বসি, প্রাণপণে নিজেকে আছড়ে দিই টেবিলের ওপর, ঢাকনা খুলতে যাই সেটা ঝনঝন শব্দে মাটিতে পড়ে যায়, তখনও কেউ আসে না, বিরাট পাত্র একটা। আমি তার ভেতর আমার কচি হাত আমূল ঢুকিয়ে দিই, তারপর ককিয়ে কেঁদে উঠে অজ্ঞান হয়ে যাই। এই দেখুন আমার ডান হাতের কনুই পর্যন্ত কেমন ছায়াময়, যেন গ্রহণ লেগেছে। ওটা কিনা গরম ভাতের ডেকচি ছিল!

চারদিকে একটা চন্দনের ভুরভুরে সুবাস ছড়িয়ে যায়। তখনই বুঝতে পারি তিনি আসছেন। সারা ছোটবেলা জুড়ে গরম ভাত ফোটার গন্ধের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে এই চন্দন গন্ধ। নতুন শাড়ির খসখস শব্দ, গৌরাঙ্গী, তীক্ষ্ণ নাক, বড় বড় চোখ সব সময়ে ওপর দিকে তোলা, পাতলা ঠোঁট, মুখে একটা না-হাসি, না-কান্না ভাব ঘাঁটি গেড়ে আছে। সবুজ পাড়ের খড়কে ডুরে শাড়ি, এঁটে সেঁটে পরা, হাতে বড় ব্যাগ। আমি হাঁ করে দেখি উনি আমার দিকে তাকালেন না, ভুলদার দিকে তাকালেন না, সোজা সোজা হেঁটে একটা বেখাপ্পা দেখতে গাড়িতে উঠে গেলেন, ওঁর পেছন পেছন গেল অনেকে— শুকুরচাচা, পরানধন ভটচায্যি, সাহেবদাদা, আরও যাদের গাড়িতে জায়গা হল না তারাও চলে গেল।

—ও কে রে, ভুলদা?

—ও তো মা, আমাদের মা।

—আমারও?

—সবাইকার।

—সাহেবদাদা, পরানজেঠা, ওদেরও?

—দূর বোকা, বড়দের আবার মা হয় নাকি!

—শুধু তোর আর আমার?

—উঁহু, আরও আরওদের। লালদা, নীলদা, দুলদা, বড়দি, বিলদি, ফুলদি।

—শুধু দাদা-দিদিদের? তাহলে সাহেবদারও নয় কেন?

ভুলদা একটু ভাবিত হয়ে পড়ে। সত্যিই তো! দাদা অথচ মা তার মা নয়, এমন অদ্ভুত ব্যাপার ছোট বোনকে ব্যাখ্যা করতে না পেরে খুব অপ্রস্তুত হয়ে যায় ভুলদা, তারপর ভেবেচিন্তে বলে—ওর অন্য মা আছে কিনা।

—আমাদেরও বেশ অন্য মা থাকলে ভালো হয়, নারে?

ভুলদা আমার সঙ্গে একমত হতে পারে না। গুঁইগাঁই করতে থাকে।

কিছুকাল পরে আমার একটা টেক্সট বুকে আমি মাকে অবিকল পেয়ে যাই। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসা।

মোনালিসাকে নিয়ে কত না জল্পনা পৃথিবী জুড়ে। তিনি কি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন? তাঁর কি দাঁত তোলা হয়েছিল বা দাঁতের ব্যথায় কাবু ছিলেন? মোনালিসা নাকি অপরূপ সৃষ্টি, ভীষণ সুন্দরী, দা ভিঞ্চির কোনও বন্ধুর স্ত্রী, নাকি কোনও বড় ঘরের মহিলা! ইত্যাদি ইত্যাদি। মোনালিসা আবার সুন্দর কোথায়? সুন্দর দেখতে হলে ভেনাসের কাছে যাও। রহস্যময়ী? রহস্য দেখতে চাও তো রবীন্দ্রনাথের আঁকা কাদম্বরী চিত্রের কাছে যাও। মোনালিসার ঠোঁটে চোখে এক ধরনের মজা পাওয়া হাসি আছে, যেন ভদ্রমহিলা বলতে চাইছেন—কী? তোমার সব গোপন কথা আমি জানি। ভেবেছ লুকিয়ে রেখেছ? না না, বলে দেব না, তবে হ্যাঁ বলে দিতেও পারি। এই রহস্য খানিকটা স্থূল। কিন্তু দিন যেতে যেতে দুনিয়ায় মোনালিসা আর রহস্যময়ী যেন সমার্থক হয়ে গেছে। আমার মা সুহাসদি ছিলেন প্রকৃত রহস্যময়ী, মোনালিসা বলতে যা বোঝায় অথচ দা ভিঞ্চির মোনালিসা যা নয়, আমার মা ছিলেন সেই প্রকৃত মোনালিসা। হাসিটা থাকত তাঁর চোখে, ঠোঁটে একটা অস্ফুট বিদ্রূপ। তিনি আশপাশের সব মানুষকে সব ঘটনাকে যেন দেখবামাত্র বুঝে ফেলেছেন, তাদেব সম্পর্কে

কী ভাবছেন সেটা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত। তাঁর নাকের তীক্ষ্ণতায় যেমন ছিল বুদ্ধি, ঔদ্ধত্য, গালের ঢৌলে তেমনি থাকত ঔদার্য, চোখের হাসিতে বিচার আবার ক্ষমা। সব মিলিয়ে ফলাফলটা যদি রহস্যময়ীর না হয়, তাহলে রহস্যময়ী কাকে বলে আমি জানি না দা ভিঞ্চি মশাই।

তবে হ্যাঁ, মোনালিসার মতো দেখতে এবং হাবভাবের আরেক মহিলা ছিলেন আমাদের ধারেকাছেই। মাসিমা বলতুম। সোনামাসি ছিলেন ময়দার মতো ফরসা, ঢিলে গড়ানে চেহারার হাসকুটে মানুষ, কিন্তু কক্ষনো মুখ খুলে হাসতেন না, হাসবেন মুখ টিপে, ঠোঁটের আগায় ঠাট্টা তামাশা, বেশিরভাগই অশ্লীলের ধার ঘেঁষে। দল বেঁধে আসতেন, হাতে পানের বাটা, পান খেতে খেতে কী একটা স্বকৃত অশ্লীল ঠাট্টায় মুখ বুজে হাসছেন, দেখাচ্ছে অবিকল মোনালিসা। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সোনামাসিকে। আসরে আমিও জাঁকিয়ে বসে গেছি, হলেই বা আট বছরের পুঁচকি, আমারও তো রিক্রিয়েশন চাই, তো সুহাসদি দূর থেকে দেখতে পেয়েছেন, হাত নেড়ে ডাকছেন, আমি তো কৃতার্থ, কিন্তু কাছে যেতেই মা আমাকে একটা কাজ ধরিয়ে দিলেন, একমাসের ধোপার হিসেব —মন দিয়ে করো, যেন ভুল না হয়। আসলে সোনামাসির আসর থেকে সরিয়ে দিলেন। স্পষ্টই বুঝতে পারলুম, কিন্তু সাহস করে বলতে পারলুম না—তাহলে তুমি থাকো, এসো তোমার কাছে গল্প শুনি।

ভুলদাকে আমি বলতুম —জানিস, আমাদের ওপর রাক্ষসের অভিশাপ আছে। মা আমাদের বেশি কাছাকাছি হলেই আমরা বজ্রের আগুনে পুড়ে যাব।

এই থিয়োরিতে ভুলদার একমাত্র অবদান ছিল—রাক্ষস নয়, দৈত্য। বেশ ভেবেচিন্তে বলত।

—রাক্ষস নয় কেন?

—রাক্ষস হলে খেয়ে নেয়, যেমন বকরাক্ষস, দৈত্য হলে খায় না, অত্যেচার করে যেমন স্বার্থপর দৈত্য।

এই আবিষ্কার করে দুজনেই এক ধরনের শান্তি পাই। যেখানে যত অস্বাভাবিক ঘটনাই ঘটুক না কেন সবের একটা ব্যাখ্যা চাই। পরে মা সম্পর্কে

আমার প্রবল কৌতূহল জাগে। মা সারাদিন কী করেন? মা কী নিয়ে এত ব্যস্ত? এত লোক আসে মায়ের কাছে তারা কে? খেয়াল করি, মা মহর্ষির পাশের ঘরে থাকেন, সারাদিন পরদা টানা থাকে। বাইরে থেকে আমার সি আই ডি কান ধরে ফেলে মাতে আর মহর্ষিতে কথা হচ্ছে। কোনও আলু পটল বেগুনের কথা নয়, ছেলেমেয়ে বা সংসারের প্ল্যানট্যান নিয়ে কোনও কথাবার্তাও নয়। দুর্বোধ্য জিনিস সব। গীতায় বলছে, রবীন্দ্রনাথ বলছেন, কবির, লালন, চৈতন্য...এই সব শুনতে পেতুম, ভেতরটা কী রকম একটা উত্তেজনায় কাঁপত, আমি এইসব জানব বুঝব, এঁদের মনোযোগ আদায় করে নেব, এইরকম একটা সংকল্প আবছা ভাবে আমার মধ্যে জেগে উঠত।

আরও খেয়াল করি মা খুব ভোরবেলায় ওঠেন, ছাতে চলে যান, ছাত ভর্তি ফুলগাছ, ছাতের ট্যাংকের কলের সঙ্গে রবারের পাইপ আঁটা আছে, সেই পাইপ ধরে মা ফুলগাছে জল দেন আর গুনগুন করে গান করেন, 'যদি এই আমারও হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো প্রভু!' 'কান্নাহাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা।' 'কেন চেয়ে আছ গো মা!' খুব যে ভালো গাইছেন তা নয়, একটু কেমন ভাঙা ভাঙা গলা, সুরেলা, তবু সুরের চেয়ে কথার ওপর জোর যেন বেশি। মা এত মগ্ন থাকতেন যে ছাতের দরজার আড়ালে যে আমি ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছি তা বুঝতেই পারতেন না। এর পর মা চলে যেতেন ছাতের ঘরে। সেটা মায়ের নিজস্ব লাইব্রেরি। একটা কোনও বই তুলে নিয়ে মা পড়তে আরম্ভ করতেন। কিছুক্ষণ মনে মনে পড়ার পরই চলে যেতেন জোরালো উচ্চারণে।

'সেইদিন সায়াহ্নকালে দু পক্ষের সৈন্য যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলে অর্জুন সংশপ্তকগণকে বধ করে নিজ শিবিরে যাত্রা করলেন। তিনি যেতে যেতে সাশ্রু কণ্ঠে বললেন, কেশব আমার হৃদয় ত্রস্ত হচ্ছে কেন? আমি কথা বলতে পারছি না, শরীর অবসন্ন হচ্ছে, বহু অশুভ লক্ষণ দেখছি। আমার ভ্রাতারা কুশলে আছেন তো?...' এই পাঠ আমি বাইরে থেকে বসে শুনতে শুরু করলুম, মা জানতেও পারলেন না। অভিমন্যুর মৃত্যুর কথা পড়তে পড়তে মায়ের গলা অশ্রুবিকৃত হয়ে যেত। কখনও কণ্ঠ ভাবে গদগদ, কখনও চাপা গলায় চিৎকার করতেন, কখনও ফুঁপিয়ে উঠতেন। আমার একেক সময়ে মনে হত

মা যদি এমন করে শোক করেন আমি অভিমন্যু হয়ে মরে যেতে রাজি আছি।

এক সময়ে মা রান্নাঘরে ঢুকতেন ঠিকই, বামনির সঙ্গে সামান্য কিছু কথা বলে বেরিয়ে আসতেন, বলার বেশি কিছু বোধ হয় থাকত না, কারণ রোজই আমাদের এক মেনু হত, সকালে একরকম, রাতে একরকম। মা দালানে একটা মোড়ায় বসতেন, পাশে ধাপির ওপর পুরো এক গ্লাস কড়া চা দিয়ে যেত বামনি-মা, আর বড় বাটিভর্তি মুড়ি, একদম শুকনো মুড়ি। এই সময়ে কাজের লোকেরা দরকারি কথা কিছু থাকলে সেরে নিত, আমরা ভাইবোনেরা মাকে সামান্য একটু পেতুম।

—কী ফুলেশ্বর, পড়ালেখা কেমন হচ্ছে? লালকমলের চিঠিচাপাটি এল?

বিলদি এসে হয় তো বলল—আমাকে শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে পলার আংটিটা করিয়ে দিও।

ভুলদার দিকে মা ফিরেও তাকাতেন না, আমার দিকে কেমন অচেনা চোখে চেয়ে কোনওদিন হয়তো বললেন— আরে এ তো বেশ বড় হয়ে গেছে।

কিন্তু যে কথাটা শোনবার জন্যে আমি হাঁ করে বসে থাকতুম সে কথাটা মাকে কোনওদিন বলতে শুনলুম না। কথাটা হল— ওকে এবার স্কুলে ভর্তি করে দাও। কিংবা জাস্ট একটা ডাক—'খুকু!'

পরের পর্বটা আরও চমকপ্রদ। মা আবার ছাতের দিকে চলে যাবেন, বামনি-মা সেখানে সরময়দার বাটি রেখে আসবে, শুরু হবে আচ্ছা করে সরময়দা মাখা। মাথা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঘণ্টাখানেক এই সব চলবে, তারপর খুব গরমের সময় ছাড়া মা ছাতের ট্যাংকের জলে গামছা ঘষে, ঝামা ঘষে চান করবেন, মাথায় কোনও কোনও দিন রিঠে-আমলা দিয়ে ঘষবেন, চুল এতখানি হয়ে ফুলে উঠবে। এবং ছাতের ঘরে মা যখন কোত্থাও কেউ নেই ভেবে একেবারে উদোম হয়ে গা মুছছেন, তখন আমি ছোট্ট পিপিং টম দেখে নিয়েছি এমন কিছু যা পরবর্তী কালে আমি মেলাব একজনের সঙ্গে। ভেনাস-ফিগার ছিলেন আমার মা। তিনি কি জানতেন? সম্ভবত হ্যাঁ। আমি যখন তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি তখন তিনি আটচল্লিশ তো বটেই। অনেক সন্তানের জননীও। তবু ওই ভেনাস-ফিগার এবং ওই যত্ন। ছাতে গাছে জল

দেওয়া আর তাদের যত্ন নেওয়ার মধ্য দিয়েই বোধ হয় মায়ের সারা শরীরের ব্যায়াম হয়ে যেত। আর ত্বক আর চুলের যত্ন ওই চানের সময়ে, প্রতিদিন।

এইটুকু ছাড়া আর সবসময়ে হয় পড়া, নয় গান শোনা, নয় বাইরে। মা বাড়ি নেই, মা? বাড়ি নেই।

এত কী কাজ থাকত মায়ের, যার জন্য ছেলেমেয়েদের খোঁজ নেবার সময় হত না? সংসার নিয়ে বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা দেখা দিত না? মা তো একরকম জমিদারগিন্নি, তাঁর নিশ্চয় কোনও পেশা ছিল না। নাকি তিনি রাজনীতি-টিতি করতেন? নাহ্ তাও না। কিন্তু আমাদের এরিয়ার দশ মাইল ব্যাসার্ধর মধ্যে যেখানে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে মা তার মুখ্য উপদেষ্টা। রাজনীতির লোকেরা, সে যে দলই হোক মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলবে, উপদেশ নেবে, সম্মান করবে, কোথায় মার কোনও পরামর্শ নিয়ে উপকার হয়েছে তার ফিরিস্তি দেবে। মোট কথা মা বাইরের সব্বার কাছে একজন দেবী স্বরূপিণী। যেটা তারা স্বীকার করবে না কিন্তু খুব স্পষ্ট তাদের ব্যবহারে সেটা হল তারা সবাই সম্মোহিত, মায়ের দিকে লুকনো কিন্তু অমোঘ আকর্ষণে তারা ধায়, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সবাই, সব্বাই, যেমন আলোর দিকে ধায় বাদলা পোকারা। সেটা সুহাসদি জানেন, জানেন খুব ভালো করে, কখনও আভাসেও প্রকাশ করেন না, তিনি জানেন। এই পূজা, ভক্তি, নিজের সম্মোহিত করবার ক্ষমতা, এর পেছনে যে ফ্রয়েডীয় আকর্ষণ, সব তিনি চুমুকে চুমুকে উপভোগ করেন।



এখন সূর্য উঠছেন। তিনি এখনও দিগন্তের নীচে। এখন অহনাকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি সূর্যোদয়ের আগে আবির্ভূত হন। আকাশ ভরে ছড়িয়ে গেছেন। সিলকের মতো সেই চকচকে লালচে-নীলে, নার্সিসাসের জিন নিয়ে জন্মেছি তো, আমি নিজেকেই প্রত্যক্ষ করি। কে তুমি অসিতবরণী! আমার মধ্যে কি সত্যিই তোমার অধিষ্ঠান? নাকি এ আমার মেগালোম্যানিয়্যাক কল্পনা! এরা পুজো করে এক শ্যামাঙ্গিনীকে ঋতুতে ঋতুতে, এক কৃষ্ণাকে বছরভর, অথচ কালো মেয়ে এদের দুটি চক্ষের বিষ। কালো, কালো, কালো! কিন্তু পাশের কালীমন্দির থেকে দীপাবলির সন্ধ্যায় যখন সংগীত উর্ধ্বে ওঠে অসাধারণ ভাবমহিমায় চতুর্দিক ভরিয়ে দিয়ে, 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর ভুবন', তখন ভাবে গদগদ হয়ে এরাই তো দোহারকি দেয়— আহা... কালো... আহা কালো...।

কালকে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি। অনেক রাত অবধি ঘুম আসছিল না, যাদের সঙ্গে কতদিন হল নিজের তাগিদে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছি, যারা আমার দুঃস্বপ্নের দিনে কখনও পাশে দাঁড়ায়নি, অথচ কিছুতেই অস্বীকার তো করতে পারব না জন্মসূত্রে তারা আমার আপনজন, কী উদ্দেশ্যে তারা এতদিন পরে আমায় ডাকাডাকি করছে? কারণটা আমি কিছুতেই অনুমান করতে পারছি না, আর সেই জন্যে আমার অঙ্গ ভরে কী অসোয়াস্তি! এ কী মহা

বিড়ম্বনা! তবে আমি ঘুমের অবাধ্য নই, কাজেই সে যখন আমার অজ্ঞাতে আমায় টেনে নিতে চায়, আমি তো বাধা দেওয়ার অবস্থায় থাকি না। খালি জেগে থাকে আমার অচেতন।

স্বপ্ন দেখলুম নীল এক মহাসমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। তেমন ঢেউ নেই কিন্তু, আমি একমাত্র বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে পরিচিত। সেখানে প্রবল ঢেউ, একটা সামলাতে না সামলাতেই আরেকটা আসে, সেখানে চান রীতিমতো এক সংগ্রাম যদি না তার ছন্দের সঙ্গে ভাব করে নিতে পারো। এ সাগর, এমন শান্ত, এত অনুকূল! আমি একে দেখিনি, চিনি না, এ কি আরব সাগর? না কি কোনও রূপকথার সাগর, যা বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর, কিন্তু ভেতরে লুকিয়ে রাখে কল্পনার অতীত কোনও ভয়ংকরকে! হয়তো ভেতরে ঝিনুকের কৌটোয় রাক্ষসের প্রাণভোমরা, যদি এক ডুবে তাকে তুলতে না পারো তোমার কপালে দুঃখ আছে।

অথচ একটু, সামান্য একটু দ্বিধা করেই আমি সেই নীলে নেমে যাই, ডুব গালি, একটা আশ্চর্য শান্তি অনুভব করি। সাগরজলে সিনান করে যখন উঠি তখন যেন সেখান থেকে উত্থিত হই লক্ষ্মীর মতো, উর্বশীর মতো। আমি এক বহুবাঞ্ছিতা, বহুবন্দিতা। সেই গৌরব অঙ্গে ধরে উঠি। স্নান করেছি, তার স্নিগ্ধতা আপাতমস্তক অনুভব করছি, অথচ আমার যেমন বেণী তেমনি আছে, চুল ভেজেনি। আর সেই ভাবেই বালুবেলা দিয়ে হেঁটে যাই, বালি আমাব গায়ে লাগে না, পায়ে বেঁধে না। সমুদ্রের সমস্ত অভ্যস্ত সন্ত্রাস যেন আমাকে মান্য করে দূরে বহু দূরে সরে যায়। আমি জেগে উঠি এক অনন্ত আনন্দলোকে। স্থির থাকি কিছুক্ষণ। এই শান্তি তো খুব সুলভ নয়! কিন্তু সামান্য ক্ষণ পরেই হুড়মুড় করে আমার ওপর ভেঙে পড়ে তারকেশ্বর, খড়দা, লালদা, লালবউদি, নীলদা একমাত্র যে এককালে আমার একটা ইচ্ছা পূরণ করেছিল। হাত ধরে ঝুলে পড়েছিলুম— আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দাও নীলদা, নাহলে তোমাকে কলকাতায় ফিরতে দেব না।

—কী করে আটকাবি? নীলদা মিটিমিটি হাসছে।

আমি হাত বাড়িয়ে একটা বাঁশের কঞ্চি টেনে নিয়েছি, বলছি,—তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব নীলদা, আমি কঞ্চি তুলি।

—বাপ রে, তুই তো দেখছি ডেঞ্জারাস মেয়ে।

নীলদা জানে না কেউ যদি সত্যি সত্যি অনুভব করে সে কোণঠাসা হয়ে গেছে, সে বিপজ্জনক হবেই, হতেই হবে তাকে। তখন সে ফ্যাঁসসসসস। সে বেড়ালই হোক, কুকুরই হোক আর মানুষই হোক।

তখনই আমি বারান্দায় এসে দাঁড়াই, বালার্ক দেখব বলে। সেই স্বপ্নের বিস্ময় চোখে নিয়ে। আরেক বিস্ময় এই 'আজি প্রাতে সূর্য ওঠা' দেখব বলে। বালার্ক দেখি কিন্তু অবিলম্বে তাকে আড়াল করে জেগে ওঠে বিলদি, ফুলদা, দুলদা ওদের যাবতীয় অনুষঙ্গ অর্থাৎ বউদিকুল, আইনি দাদাকুল নিয়ে। বিল্বেশ্বরী, ফুলেশ্বর, দুলেন্দ্র, নীলকমল, লালকমল।

আমি ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে বাবুইয়ের ভোরের ঘুম দেখি। বাথরুমে যাই, চান করে তৈরি হয়ে নিই। আমার ছেঁড়া ছেঁড়া দেখতে মাটি রঙের জিনস, আমার গাঢ় গেরুয়া পাঞ্জাবি, নকল রুদ্রাক্ষের কণ্ঠবেষ্টনী, হাতে শিখেদের মতো কড়া, চুলটাকে চুড়ো করে ধরে আচ্ছা করে তাতে গার্ডারের পাক দিই, তার ওপর কালো আর ছাই মাখা কিলিপ, সঙ্গে কাঁথার কাজ করা মোটাসোটা ঝোলা, তাতে আমার ব্যক্তিগত —সাবান, তোয়ালে, ট্যালকাম পাউডার, ব্রাশ টুথপেস্ট, একতাড়া কাগজ, মানে রাইটিং প্যাড, কলম, টাকা-পয়সার পার্স। আমি কারও সাবান, তোয়ালে ব্যবহার করি না, গোঁসাই পরিবারের তো নয়ই।

প্রথমে ট্যাকসি ধরে শ্যামবাজার যাব, তারপর খড়দার বাস। নামব একেবারে ওদের বাড়ির সামনে, যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি আট বছর আগে।

আট বছর আগে—এই শব্দচয় একটা বিখ্যাত কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। একই শব্দবন্ধ কত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে, ভাবলে অবাক লাগে। আজ আট বছর পরে, আমি কিন্তু একা একা কোনও গাছের কাছে একগাছা দড়ি হাতে যাইনি কোনও বিচিত্র একাকিত্বের বোধে, পরিষ্কার বেঁচে আছি, বেঁচে আছি আমার নিজের শর্তে। এবং আমি আজ আহূত হচ্ছি তাদের দ্বারা, যাদের কোনও গুরুত্বই আমার কাছে নেই, অথচ বুঝতে পারছি এক অর্থে আছেও।



মহর্ষি

মায়ের পাশের ঘরে উনি থাকেন। পরদাটা একটু একটু ওড়ে, তখন আরাম চেয়ারে শুধু দুটো পায়ের তলা ভালো করে দেখা যায়। আমি অবশ্য জানি তার ওপরে আছে সাদা ধবধবে পাজামা, তারও ওপরে ধানী রং পাঞ্জাবি, তারও ওপরে একটি রেখাময় গলা, মুখ, হাত দুটো দু দিক থেকে কোণ করে ধরে আছে কোনও বই, নিষ্কম্প হাত পা, বইটি পড়ছেন উনি। মাঝে মাঝে পাশের টেবিল থেকে, কিংবা নিজের পকেট থেকে পেন বা পেনসিল বা জটার দিয়ে দাগ দেন, মার্জিনে নোট করেন কিছু কিছু। পুরো দৈর্ঘ্য মেলে উনি যখন উঠে দাঁড়ান তখন বেশ একটা এফেক্ট হয় আমি বুঝতে পারি, আশপাশে সবাই কেমন হাত জোড়, গদগদ ভাব, কিন্তু আমি সবচেয়ে ভালোবাসি ওঁর ওই পা দুটো। পুরো গোলাপি রঙের, নিটোল পদদ্বয়, আঙুলগুলো টসটস করছে, যেন লজেন্স, আমার মহর্ষির পায়ের আঙুলগুলো চুষতে ইচ্ছে করে, বুঝি তাদের থেকে বেরোবে কোনও আশ্চর্য, অমৃতোপম রস যা পান করে আমি বল, বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, ঐশ্বর্য সব পাব। কেন এমন মনে হত জানি না, হয়তো বালক বুদ্ধিতেই, কিন্তু কেমন করে পান করতে পারব ওই মহার্ঘ আঙুল সেটা আমার নিভৃত জল্পনার বিষয় ছিল।

মোনালিসা যেমন সবসময়ে ঘোরাঘুরি করছেন, এখানে যাচ্ছেন, ওখানে যাচ্ছেন, মহর্ষি তেমন স্থির, অচলপ্রতিষ্ঠ। তাঁর ঘরে সবসময়ে হাজির থাকে ময়না, একটি শুকসারী জাতীয় মেয়ে, সে ওঁর ফরমাশ খাটে। জলখাবার নিয়ে যাচ্ছে, ঘর ঝাঁটপাট দিয়ে দিচ্ছে থেকে থেকে, কোনও বই দরকার হলে এগিয়ে দিচ্ছে। কেউ দেখা করতে এলে বেরিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আসছে, উপস্থিত থাকবে কি থাকবে না, বুঝে নিচ্ছে মনিবের ইশারায়। দরকারমতো পা টিপে দিচ্ছে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। অনেক সময়ে মহর্ষিকেও দেখেছি ময়নার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। ময়না খুব পরিষ্কার, ডুরে ডুরে শাড়ি এমন আলগোছে পরে, যেন আর একটু হলেই তার শরীরের সহজাত ময়লা তার কাপড়ে-চোপড়ে লেগে যাবে, কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের শুচিবাই। এই শুচিবাই সে মহর্ষির কাছ থেকে পেয়েছে, না মহর্ষি তার থেকে পেয়েছেন আমি বুঝতে পারি না।

মহর্ষির সঙ্গে ময়নার এই নিকটত্ব আমি সহ্য করতে পারি না। আমার মনে হয় ওখানে আমার থাকবার কথা, ময়না আমার জায়গাটা নিয়ে নিচ্ছে। আরেকটু বড় হয়ে নিই আমি এর একটা বিহিত করব। ইতিমধ্যে আমি ভুলদার সঙ্গে যাবতীয় খেলা খেলি ওই দালানে। চোরচোর, লুকোচুরি, ডাং গুলি, এক্কাদোক্কা, লুডো, কাটাকুটি সব—সব। উদ্দেশ্য হল দৃষ্টি আকর্ষণ করা, মহর্ষির বা ময়নার।

আস্তে আস্তে বড় হই আর শুনতে পাই, মহর্ষি এক জমিদার, রাজাগোছের মানুষ। জমিদার বা রাজা তো এখন আর হয় না। তবে তাঁর জমিদার হওয়া জন্মসূত্রে নয়, এ সব ধন সম্পত্তি তিনি সারাজীবন মাথা খাটিয়ে, উপার্জন করেছেন, ভীষণ বৈষয়িক বুদ্ধি ধরেন তিনি। কিন্তু একবার এই উপার্জন হয়ে যাবার পরে তাঁর আর এ বিষয়ে কোনও মোহ নেই, আসক্তি নেই। তিনি একজন ফিলসফার মানুষ। পড়াশোনাই তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করেন যোগেশকাকা, কিন্তু তার হিসেবপত্তর সব ওঁর মাথায় আর ফাইলে। উনি একজন ব্যতিক্রমী মানুষ, একজন সেইন্ট, আবার একজন ক্ষুরধার বুদ্ধিধারী। যোগেশকাকা বলেন এঁরাই পৃথিবীতে সাম্রাজ্য গড়েন, জমিজায়গার সাম্রাজ্য, চিন্তার সাম্রাজ্য, ভাবজগতে এঁদের ঘোরাফেরা। আর তাই সকাল-বিকেল একটা নির্দিষ্ট সময়ে ওঁর ঘরে লোক আসার কামাই নেই।

সবাই বলে—মহর্ষি, কিংবা নারায়ণ ঠাকুর, শুধু ঠাকুর।

এই সমস্ত সময়ে আমার মনে একটা অনির্বচনীয় প্রশ্ন জাগে। বুঝলুম উনি সেইন্ট, বুঝলুম মোনালিসা দেবীস্বরূপিণী। কিন্তু আমরা কে? আমাদের অবস্থান কোথায়? আমরা কেন এত সাধারণ? বিশেষত আমি! এবং ভুলদা-ও। ভুলদার বুদ্ধি পাকেনি, কেমন ছেলেমানুষি কথাবার্তা, যত বড় হই বুঝতে পারি ভুলদা যেন একটু কেমন কেমন, অনেক সময়ে ওর মুখ দিয়ে নাল গড়ায়, চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা শূন্যতা, বোকাটে ভাব, আমার যেমন পড়াশোনার জন্য ভীষণ আগ্রহ আছে, ওর তাও নেই, ও এখনও ছবির বই নিয়ে বসে থাকে, আর খায়, অসাধারণ খেয়ে চলে। টেবিলের ওপর খাবার রাখা থাকে, সেখান থেকে ঝকঝকে কাঁসার থালায় হাতায় করে করে তুলে নিতে থাকে ভাত আরও ভাত, ডাল আরও ডাল, তার ওপর তরকারি, তার ওপর মাছ, মুঠো করে করে খায়, নেবার সময়ে, খাবার সময়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সব, আমি একেক সময়ে চিল চিৎকার করে উঠি—ভুলদা সব খেয়ে নিচ্ছে, মহর্ষির ঘরে উড়ে গিয়ে পরদা সরিয়ে বলি, ভুলদা কিন্তু সব খেয়ে ফেলছে।

উনি ময়নাকে ডাকেন, ময়না কি ইচ্ছে করেই ঢুলছিল? আমি বলে উঠি—ময়না না, ময়না ওকে মারবে-এএএ।

উনি তখন ওঠেন, দু চার পা চলেন, চটি দুটো পায়ের কাছে এগিয়ে দেয় ময়না। উনি বাইরে এসে দাঁড়ান— ভুল ভৈরব! ভুল ভৈরব! কী করছ?

—আমার খিদে পেয়েছে।

—আরও সবাই আছে, তাদেরও খিদে পাবে বাবা! আর এত নোংরা করলে সবাই খুব ঘেন্না পাবে, ঠিক করে করো।

পেছন থেকে ময়না বলে— যদি সবটিই ঠিকঠাক সামলাইতে পারবে খাইলে ও ভুল কেনে গো?

আমার সমস্ত মন করুণায়, কষ্টে, ঘৃণায় ফুটতে থাকে। জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে চেয়ে বলি— না ও ভুল না, ও ভুল না, তোমরা ভুল, পা ঠুকে ঠুকে আমি বলতে থাকি, তোমরা সব্বাই ভুল। মহর্ষি ভুল, লালনীলবিলফুলদুল সব স-ব্বাই ভুল। আমরা এখানে থাকব না, আমাদের সত্যি মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও, দাও বলছি! কেন আমাদের ধরে এনেছ? ছেলেধরা! তোমরা

ছেলেধরা! বলতে বলতে আমি আছড়ে পড়ি মাটিতে, মাথা কুটতে থাকি।

মহর্ষি হঠাৎ এগিয়ে আসেন, লুণ্ঠিত আমাকে ধূলি থেকে তুলে নেন, তারপর খুব নম্র, প্রায় আর্দ্র গলায় বলেন —খুকু, একবার বাবা বলো তো মা, এই তো, এই তো তোমাদের বাবা!

—ভুলদাকে কোলে নাও, আমি কমান্ড করি, এঁটোসুদ্ধ কোলে নাও।

ভুলদা যথেষ্ট বড়, তাকে কাছে টেনে নিলেন মহর্ষি, বললেন— কে জানে যারই ভুল হোক, সব ভুল তো শেষ পর্যন্ত আমার খাতাতেই জমা পড়বে।

যে কথা জেনেও জানতুম না, সে কথা সেই প্রথম পরিষ্কার করে জানলুম, জানলুম মহর্ষি আমার বাবা। এবং যদিও তাতে আমার ঐহিক অবস্থার তেমন কোনও তারতম্য হল না, কেননা বৈষয়িক হলেও মহর্ষি বোধ হয় একেবারেই সাংসারিক ছিলেন না. একটা বিপ্লব ঘটে গেল আমার মনোজগতে। আমি ধরতে পারলুম আমি ওঁকে আঘাত দিতে পেরেছি, কোথাও ওঁর মধ্যে সূক্ষ্ম বেদনাবোধ জাগাতে পেরেছি। ওঁকে বার করে আনতে পেরেছি ওঁর খাঁচার ভেতর থেকে।

ঠিকই বুঝেছিলুম, কারণ এর পর থেকেই ও ঘরে আমার যাতায়াত অবাধ হল। ময়না এখনও ওঁর খাবারবাহক, কিন্তু বইপত্র এগিয়ে দিই আমি, উনি ভুলে যান আমি বাচ্চা মেয়ে, আমার সঙ্গে বইয়ে পড়া নানান বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা না করলে ওঁর শান্তি হয় না। আসলে আমাকে উপলক্ষ করে উনি নিজের সঙ্গেই আলোচনায় মাতেন, আমি না বুঝেও শুনতে থাকি, ক্রমশ না বুঝেও একরকম করে বুঝে ফেলতে থাকি।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ— এই যে কথাটা বললেন এর কী ব্যাখ্যা হতে পারে বল তো খুকু?

—কে বললেন, কখন বললেন? কাকে বললেন? আমি জিগগেস করি।

—শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে, বললেন অর্জুনকে, যখন অর্জুন সামনে নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে দেখে যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না।

মহাভারতের গল্পটা আমার জানা ছিল, আমাদের দাসীটারও বোধ হয় জানা ছিল। বললুম—অর্জুন ঠিক বলেছিলেন।

ঠিক ভুলের কথা বলছি না, কথাটার মানে কী? তবে অর্জুন যে ঠিক

বলেননি অভিজ্ঞতা হলে তুমিও হয়তো হাতে কলমে একদিন... জানতে পারবে।

—ধর্ম মানে কী?

—এই তো একেবারে ঠিক জায়গাটিতেই ধরেছ। ধর্ম মানে নিয়েই তো যত গণ্ডগোল। এখানে ধর্ম মানে স্ব-ভাব, নিজের শিক্ষাগত ও সহজাত ভাব।

—যার শিক্ষা নেই? এটা আমি আমার কথা ভেবে বললুম। আমি তো স্কুলে পড়ি না—তাহলে তার ধর্মও নেই, যোগ করে দিই। উনি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তারপর মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বললেন—একদম ঠিক বলেছ, যার শিক্ষা নেই, তার ধর্ম নেই, ধর্মবোধ নেই। কিন্তু সুখের কথা, কিছু না কিছু শিক্ষা, ট্রেনিং সবাইকারই আছে। এখন, কেউ যদি ভাবে ধর্ম মানে তার পেশা, পূর্বপুরুষের পেশা, তাহলে কী সর্বনাশ হবে শোনো।

এক পুরোহিতের বাড়ি। তিনি পুজো করেন ভক্তি ভরে, বাড়িতে কোনও অভাব নেই, একটি ছেলে আছে, সেও শিখছে, কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, তা ছাড়াও শিখছে পুজোর নিয়মকানুন। একদিন তার বাবা তাকে ডেকে বললেন—আজ তোমাকে একটা নতুন জিনিস শেখাব, মাঝ রাত্তিরে প্রস্তুত থেকো।

মাঝ রাত্তিরে ছেলে দেখল তার বাবা মালকোঁচা মেরে ধুতি পরেছেন, মদ খেলেন খুব খানিকটা, চোখ রক্তবর্ণ হল, হাতে তাঁর খাঁড়া, ছেলের হাতে একটি লাঠি ধরিয়ে দিলেন। এবার অমাবস্যার কুপকুপে অন্ধকারে দুজনে চললেন পথের দিকে, গিয়ে দাঁড়ালেন একটা ঝুপসি গাছপালা ভর্তি জায়গায়। কিছুক্ষণ পর সেখান দিয়ে একটি লোককে আসতে দেখা গেল। বাবাটি তার ওপর লাফিয়ে পড়লেন, খাঁড়ার এক ঘায়ে ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা হয়ে গেল। ছেলেটির তো ভয়ে গা কাঁপছে, সে বললে, বাবা এ কী? এ ভয়ানক কাজ কেন করলেন?

বাবা বললেন— কী জান বাবা, আমরা এই এক পুরুষ আগেও ডাকাত ছিলুম। আমার বাবাই প্রথম ওই বৃত্তি ত্যাগ করে পূজার্চনা, লেখাপড়া ইত্যাদি ধরেন। কিন্তু আমাদের ধর্ম তো আসলে দস্যুতা। তাই বছরে একদিন কুলধর্ম পালন করি এই ভাবে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন কিনা স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ,

পরধর্মো ভয়াবহঃ। কোনওদিন কোনও পথিক যদি অস্ত্রধারী হয়, যদি সে আমাকে হত্যা করে, তখন আমার ধর্মমতেই মৃত্যু হবে, আমি স্বর্গে যাব। —এখন বুঝতে পারছ খুকু, গীতা ফলো করা কী কঠিন!

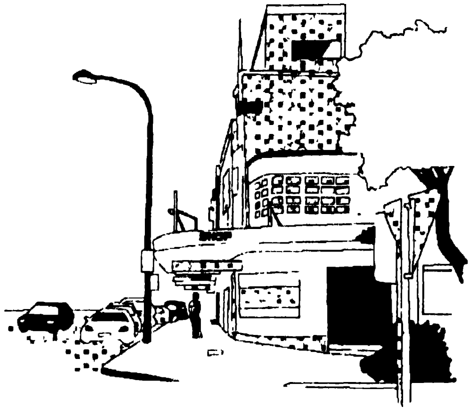
—ফলো করতেই হবে কেন? না করলেই তো হয়! আমি অকুতোভয়। এবং উনি হাসতে থাকেন, হাসতে থাকেন।

—লাখ কথার এক কথা বলেছ, ফলো না করলেই তো হয়! তাহলে কী ফলো করবে? জীবনে কিছু না কিছু তো ফলো করতেই হয়!

আমি এত কথা বুঝি না। গীতার কথা আমি উঠতে বসতে শুনছি, ফলো করার মানেও জানি। কিন্তু গীতা ফলো করতে হবে কেন, ওই রকম হাস্যকর বিটকেল গল্পের অবতারণাই বা কেন করতে হবে, আমি বুঝি না। আমি শেষে বলি— জীবনে খেতে হয়, জামাকাপড় পরতে হয়, বড়-বাইরে ছোট-বাইরে করতে হয়, ঘুমোতে হয়, আর আর পড়াশোনা করতে হয়, আমি মাথা ঝাঁকাই. আমি পড়াশোনা করি না, আমি পড়াশোনা করব-ওওওও।

তাতে মহর্ষি কী বললেন জানেন? বললেন— এই তো পড়াশোনা করছ, আমার কাছে কতক্ষণ কাটাচ্ছ, তোমার বয়সে গীতা আলোচনা করতে পারে এমন আর একটা মেয়ে কেউ দেখাক তো দেখি!

আমার পড়াশোনার কথা বলবার উদ্দেশ্য ছিল ওঁকে জানানো আমি স্কুলে পড়ি না এখনও, আমায় স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হোক। সমস্তটাই বৃথা গেল।



সকালবেলার হাওয়া এত সুন্দর! আমি ট্যাকসির কাচ নামিয়ে দিই। হো হো করে হাসতে থাকে হাওয়া, খেলতে থাকে আমার চুলের সঙ্গে। দোকানপাট সব বন্ধ, গড়গড় করে শাটার টানার শব্দ শুনতে পাই ওগুলোর দিকে তাকিয়ে। আবর্জনা তোলার গাড়ি যাচ্ছে, সত্যিই তাহলে এসব আছে! আবর্জনার গাড়ি, ঝাড়ুদার, পে-লোডার...। রাস্তার এদিকে ওদিকে জেগে উঠছে ফুটপাথ- ঘুমোনিরা, সবাইকার সকাল।

এক সময়ে একটা এন জি ওতে কাজ নিয়েছিলুম। বস্তির মেয়েদের মধ্যে কাজ, তখন খুব দরকার না থাকলেও ইচ্ছে করে ওদের ঘরে থেকেছি ক'দিন। মানুষেই তো পারে, আমিই বা পারব না কেন? তখন ঘরের পুরুষ কীভাবে মেরে ধরে বউয়ের লোকের বাড়ি খেটে খেটে পাওয়া টাকা হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়, দেখেছি। তিনটে বাচ্চা। দুটো মেয়ে, একটা ছেলে। সকালবেলা বউটি ছেলেকে একবাটি দুধ খেতে দিল, আমাকে আর মেয়েদুটিকে লাল চা। জিগগেস করলুম— মেয়েদুটি কী দোষ করল, তাদের দুধ জুটল না কেন?

বলল— ক্ষ্যান্তদিদি এইজন্যেই বলে— এঞ্জিদের ঘরে ঢুকতে দিবি না। বড্ড নাক গলায়। আপনি জানো না কেন দিইনি? নেই বলে, আবার কেন?

—ছেলেকে তো দিলে, ও-ই তো সবার বড়।

—সবগুলিকে দিতে পারব, নিজেও খেতে পাব, সেই ভাগ্যি কি করে এসেচি দিদি! ও হল গিয়ে পুরুষ ছেলে ওকে তো এটুকু দেতেই হয়, মেয়েমানুষের

বাল্মিক হলেও চলে যায়।

—তাই বুঝি? কেন বলো তো?

—সারা জীবন ব্যাটাছেলের কত ঝক্কি, খেটে খেতে হবে, সংসার প্রেতিপালন করতে হবে, একটু গলা খাটো করে বললে, দুধ আসবে নাকো ব্যাটাছেলের ইয়েতে। বোঝো না কেন দিদি?

—মেয়েদের যে বাচ্চা ধারণ করতে হবে, পালন করতে হবে, খেটেও খেতে হবে, তুমিও তো খেটেই খাচ্ছ, রোজগার করছ, সংসার পালন করছ, তোমার বর তো এ সব করছে না!

—সে আমার অদেষ্ট! আর কি জানো দিদি আমাদের কাজ হল ঘরঘরুস্তি কাজ, ব্যাটাছেলেদের হল গায়ের জোরের কাজ।

—তোমার বর কি কুলির কাজ করে নাকি?

—কেন আমার বর কুলি হতে যাবে, তোমার বড্ড মুখ দিদি, মুখে পোকা পড়ুক। সে মিস্তিরির জোগাড় দেয়।

আমি বকুনি খেয়েও বলতে ছাড়ি না—মিস্তিরির জোগাড়ের কাজে যেটুকু শক্তি লাগে, তোমাদের পাঁচ বাড়ি বাসন মাজতে কাপড় কাচতে, ঘর ঝাঁট দেওয়া পোঁছা করতে তা লাগে না বলছ?

ও ফট করে বদলে গেল, বলল—তোমাদের মতন মায়া নিয়ে সবাই যদি দেখত দিদি তালে তো আর ভাবনাই ছিল না। এই যে দেকচো ছেলেটাকে বেশি করে যত্ন আত্তি করচি, ইস্কুলে পাটাচ্চি, একন থেকেই মুখের ওপর চোপা করে।

—তুমিই শেখাচ্ছ।

—আমি?

—তুমি ওকে বুঝতে দিচ্ছ ও দামি, অন্যদের চেয়ে ওর দাবি বেশি, ও-ও ওর বাবার মতো করবে বড় হলে। তোমরা ওদের এমন করে বড় করছ বলেই ওরা এমন তৈরি হয়েছে। শুধু আমি নই, অনেক লেখাপড়া জানা মানুষ এ সব বলছেন, বলছেন তোমাদের ব্যবহারের বদল দরকার।

—থালে কী করতে পারি? হাঁটুর ওপর কনুই রেখে উবু হয়ে বসে নর্মদাদিদি জিগগেস করল। লেখাপড়া জানা মানুষদের কথায় ওর ভক্তি ও ভয় হয়ে থাকবে।

সে দিনই রাত্রে ওর বর হামলা করল। মেরে ধামসে দিচ্ছে যখন, আমি বললুম এই আমি চললুম থানায় আমায় চেনো না, একেবারে থানায় ভর্তি করে ছাড়ব,

তারপরে পুলিশের ঠ্যাঙানি খাও গে।

লোকটা ফিরে তাকিয়ে বলল— এ কে রে?

—তার বউ বলল— তোমার যম মুখপোড়া, এক্ষুনি বেরোও।

পর দিন ছেলেটাকে বাইরে পেয়ে চোরের ঠ্যাঙানি ঠ্যাঙালে লোকটা। এই বার নর্মদাদিদির বাঁধ ভাঙল, কীসের বাঁধ তা আমি বলতে পারব না। প্রথমত ছেলেটাকে ঘরে ঢুকিয়ে তার গায়ে গরম তেল মালিশ করতে করতে বলল —দ্যাখ হারামজাদা দ্যাখ, মায়ে বাপে তফাতটা দ্যাখ, দেখে মনে রাখ, আর কোনওদিন যেন আমার মুখের ওপর চোপা না শুনি, বোনেদের ঠেঁয়ে মুড়ি বাতাসা কেড়ে নেবার আগে মনে রাখবি ওরাও তোর মায়ের জেত। হুঁঃ, ভাত দেবার কেউ নয় কিল মারবার গোঁসাই!

মেয়েগুলোর লেখাপড়ার দায় এন জি ও-টা নিয়েছিল, ছেলেটাই বা করপোরেশন স্কুলে কী শিখছে? তাকেও একটু দেখতে বলে আসি। মাঝখান থেকে আমার মাথাটা উকুনে ভরে গেল।

ট্যাকসি শেয়ালদা স্টেশনের কাছাকাছি এসে গেছে, দেখি অজস্র দিনমজুর জেগে উঠছে, পাশে এদের বড় বড় ঝুড়ি বিঁড়ে, যে যেরকম অবস্থায় ছিল ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধহয়, সেই রূপকথার দৈত্যটা হঠাৎ বুঝি তার লোহার কাঠিটা বুলিয়ে দিয়েছিল, তাই। এখন সেই সব ট্যাবলো সচল হয়ে উঠছে, আমি যেন এক নতুন শহর, নতুন জীবন দেখছি। তাজা হাওয়া আমার শরীরের ওপর, তাজা দৃষ্টি আমার চোখে। এই দৃষ্টি নিয়ে আমার হঠাৎ মনে হল, যাদের ছেড়ে এসেছি তারা কে? তারা আমার কে? যাদের সঙ্গে আছি তারাও আমার কেউ নয়। ধরো আমরা একটা লম্বা ভ্রমণে বেরিয়েছি, পথে কত জনের সঙ্গে দেখা হয়, কত জনের সঙ্গে রীতিমতো ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়, বাড়ি ফিরে এসে কারও কারও সঙ্গে কিছুদিন যোগাযোগ থাকে, তারপর? তারপর নতুন পাতা, নতুন পরিচয়। জীবনযাত্রাটাও বোধহয় এইরকম। একটা অদ্ভুত আনন্দিত একাকিত্ববোধে আমার হৃদয় ভরে গেল। তাহলে আমি যাব কেন? সেই লালদার বাড়ি, সেই সব দাদা দিদি, কেন? কেন? কেন? ওরা তো আমার কেউ নয়! উত্তর খুঁজতে থাকি। খুঁজতে থাকি। কিছুক্ষণ পরে উত্তরটা ফ্ল্যাশ করল। ওদের একটা প্রচণ্ড দরকার পড়েছে, আমি না হলে কিছুতেই চলবে না। তাই। এবং সেই পরস্মৈপদী দরকারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাচ্ছে আমার কৌতূহল।

লালমাধব-নীলমাধব

রূপকথার লালকমল-নীলকমল জোড়া পুত্তুর আমার চোখের সামনে দিয়ে রাক্ষস মারতে চলে যায়। আমি তখন দালানে, চকখড়ি দিয়ে লিখছি আমার নিজের বানানো রূপকথা। এমন সময়ে ওপর থেকে নেমে এল ওরা। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে কথা বলছে, আর কোনওদিকে চাইছে না, যেন আমি নেই, ভুলদা নেই, কেউ নেই কেউ নেই ওড়ে শুধু একজোড়া পায়রা। লক্কা পায়রার মতন পেখমমেলা শৌখিন চেহারা ওদের। লাল ফরসা, নীল কালো, কিন্তু এক ধরনের, যেন যুক্তি করে জন্ম নিয়েছে দুজনে, পৃথিবীর যাবতীয় রাক্ষস নিকেশ ওরা দুজনেই করবে। পবিত্র বিশ্বাসে আমি মুগ্ধ চোখে ওদের দিকে চাই। ওরা বেরিযে যায়। আমি কল্পনা করতে থাকি শনশন করিয়া দুই রাজপুত্র চলিয়া যায়, কৃষাণ ভয়ে বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, বারবার নমস্কার করিতে থাকে। আমিই সেই কৃষাণ, আমিই সেই মাটি, আমিই সেই নমস্কার। ভুলদাকে ভাগ দিতে চাই আমার এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের, বলি দ্যাখ লালদা রানির ছেলে, বীর কিন্তু একটু দুর্বল, কেউ কেউ ওকে ভয় পায় না। কিন্তু নীলদা রাক্ষসী মায়ের ছেলে, তাই সে যেমন বীর, তেমনি তাকে ভয় করে সবাই।

শুনে ভুলদা প্রবল আপত্তি করে। না না, ওরা কক্ষনো রানি রাক্ষসীর ছেলে না, ওরা সবাই মায়ের ছেলে, আমাদের মায়ের, এই খুকু খবরদার আমার মাকে রানি বলবি না, রাক্ষসী বলবি না-আ।

ঠিক আছে বলব না, কিন্তু সেক্ষেত্রে তো ওরা রাক্ষস-বিনাশী লালকমল-নীলকমল হতে পারে না। কাকে বোঝাই! কাকে বোঝাই! আমার নিজের জগৎ যে একান্তই আমার নিজের, তাকে আর কোথাও ছড়িয়ে দেওয়া যাবে না, সেই থেকেই আমার বোঝার শুরু। কিন্তু লালনীলকে আমি অন্য ভাবে দেখি, আপন মনের মাধুরী মিশায়ে। লাল একবারে পাশ করতে পারল না, নীল হইহই করে পাশ করে গেল। আমি মনে মনে বললুম— তা তো হবেই, নীল যে রাক্ষসী মায়ের ছেলে! কিন্তু এইবার যেটা হবার কথা ছিল সেটা হল না। লাল-নীলের ভাবভালোবাসায় চিড় ধরল। নীল এম কম পড়ছে, লাল পোস্ট আপিসের কাজে ঢুকে গেল। রাত্তিরে পড়ে পাশ করবে। আর ওদের একসঙ্গে দেখতে পাই না। নীল পড়া সেরে, আড্ডা সেরে বাড়ি ফিরল তো লাল আপিস করে, এক কাঁসি মুড়ি-ছোলাভাজা খেয়ে রাতের ক্লাস করতে বেরিয়ে গেল।

মহর্ষিকে বলি —বাবা বাবা, তুমি ওদের মিল করিয়ে দাও না, নাহলে আমার গল্প মিলছে না যে!

উনি বলেন—প্রথমত ওদের মিল নেই এটা তোমাকে কে বলেছে? আর দ্বিতীয় কথা, এই জন্যে যদি তোমার গল্প না মেলে তবে গল্পটা বদলে নাও। নিরেট সত্যি দিয়ে তো গল্প হয় না, গল্প জিনিসটা হল গল্প হলেও সত্যি। এই ধাঁধার সামনে অতএব আমি চুপটি করে বসে থাকি। বুঝতে খারাপ লাগে, ভুলদা যেমন ভুল, আমার লালকমল- নীলকমলও তেমন ভুল। আসল হল—মোনালিসা-মায়ের দুই ছেলে লালমাধব আর নীলমাধব। হাতের পাঁচটা আঙুল যেমন সমান হয় না, পাঁচটা ছেলেও তেমন। লালের ধৈর্য নেই, মনোযোগ নেই, ওর কোনও অ্যামবিশনও নেই, ওদিকে নীল বেশ মেধাবী, ও নাকি অনেক দূর যাবে। কথাটা সত্যি কিনা পরীক্ষা করতে আমি একদিন লালদাকে গিয়ে ধরি—লালদা লালদা আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দাও না।

লালদা বলল—যাঃ যাঃ, আমার বলে নিশ্বাস ফেলার সময় নেই, এখনও ভর্তি হোসনি কেন? নেয়নি? না কী? যা, দিক করিসনি।

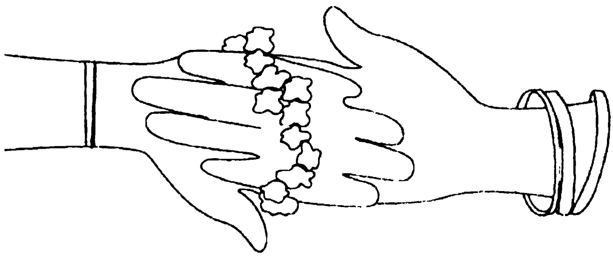
তখন আমি নীলদাকে গিয়ে ধরলুম— তুমি আমায় স্কুলে ভর্তি করে না দিলে আমি তোমায় কলকাতা যেতেই দোব না!

নীলদা হেসে বলল— কেমন করে আটকাবি?

আমি একটা ছোট বাঁশের কঞ্চি নিয়ে বললুম—তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব।

নীলদা আমাকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিল। ব্যাপারটা যে এত সোজা আমার ধারণাই ছিল না। হেড মিসট্রেস বললেন, ওমা সে কী কথা, তোমাদের সময়ের অভাব বলে মেয়েটা স্কুলে ভর্তি হতে পারছিল না? ও নিজে এসে বললেই তো হয়ে যেত, টাকা-পয়সা যা লাগে আমি ওঁদের কাছে চেয়ে পাঠাতাম, মিটে যেত।

সেই থেকে আমি কেমন করে জেনে গেলুম যেটা চাই, নিজে নিজে আমায় সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। জেনে গেলুম লালের ধমনিতে যে রক্ত বয় সেটা ফ্যাকাশে লাল। নীলদার রক্ত হয়তো প্রকৃত লাল।



কোথায় বাড়ি! বাড়ির জায়গায় দেখি এক আখাম্বা ফ্ল্যাট উঠেছে। নীচে অন্ধকার সিঁড়ির তলায় সার সার লেটার বক্স। তিন তলায় লালদার ফ্ল্যাট। সিঁড়ি ভাঙি। এই পরিবর্তনটার কথা আমি জানতুম না। কে-ই বা আমায় বলবে, কেনই বা বলবে? পালিশ করা কাঠের দরজার সামনে এসে বেল টিপি।

—এসেছিস? এক বিপুল মহিলা আমায় বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন, গলা শুনে বুঝি এটা বোধ হয় বিশ্বেশ্বরী, আমার বিলদি, যার ফরসা রঙের খাতিরে বিরাট বড়লোকের বাড়ি বিয়ে হয়েছে, এবং যে চরিত্রগুণে স্বামীকে হাত করে, শ্বশুরবাড়িতে একাধিপত্য চালায়, তার পরেও যার লোভ মেটে না, প্রত্যেক বার আমাদের বাড়ি এসে যে মায়ের রক্তপ্রবালের হার, চুনির কণ্ঠী ইত্যাদি হাতিয়ে নিয়েছে। মেদের ভাঁজ থেকে হাঁসফাঁস করতে করতে মুক্তি পেয়ে ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতে দেখি চক্রব্যূহে জড়িয়ে গেছি। চারপাশে কতকাল আগে চেনা কত মুখ, যেন পূর্বজন্ম থেকে উঠে এসেছে, এখনও পূর্বজন্মের জলের ঝাপসা তাদের মুখে। আমার সহজাত রক্তের টান সেই জলে পাক খাচ্ছে, পাক খাচ্ছে, ঘুলিয়ে উঠছে, পাতলা হয়ে যাচ্ছে, আবার ঘনত্বের দিকে যাচ্ছে, আমি অনেক কষ্টে আমার ভাবাবেগ সামলাই, কাউকে কিছু বুঝতে দিই না। জলের তল থেকে কাঁপতে কাঁপতে প্রথমে একটা কিম্ভূত কিছু দেখা দেয় আর ভেঙে যায়, পরে বুঝি এটা লালমাধবিনীর মুখ। সেই যিনি আমাকে

পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমি এখানে উদ্বাস্তু।

কী হয়েছে লালবউদির? সমস্ত মুখটা টিউমারে ভর্তি। গলা থেকে, গাল থেকে কপাল থেকে ঝুলছে টিউমার। বীভৎস হেসে লালবউদি বললে— দেখেছ কী হয়েছি তোমার দাদার দয়ায়!

মায়ের দয়া একটা রোগকে বলে শুনেছি, কিন্তু দাদার দয়া বলে এ যাবৎ কিছু শোনা ছিল না। বিলদি আমাকে টিপল— উত্তর দিসনি, বেচারা, বুঝতেই তো পারছিস!

লালদা খুব রোগা হয়ে গেছে, কিন্তু ওর রং এখনও জ্বলে যায়নি। ভীষণ রোগা, ভীষণ ফরসা, ও যেন কেমন হয়ে গেছে, আট বছর, মাত্র আট বছরে এত চেঞ্জ আমি আশঙ্কা করিনি। ফুলটুসকে চিনতেই পারিনি। আট বছর আগেও ও কেমন ছিল আমার জানা নেই। কারণ ওকে কখনওই দেখতে পাওয়া যেত না। হয় ও ফিজিক্স-এর ট্যুইশনে, নয়তো কেমিস্ট্রির, নয়তো ম্যাথস-এর আর তা নয়তো এক্সট্রা কারিকুলার কিছু। একজন চমৎকার যুবককে দেখে ভালোই লাগল, আহা ঘরখানা যেন ওর শক্তিতে সামর্থ্যে জ্বলজ্বল করছে। এর পরে আমার চোখ পড়ল একটি ম্যমির ওপর। রানি নেফারতিতির ম্যমি। অদূরে ডিভানে সিংহাসনে শয়ান নেফারতিতির ম্যমি সোজা আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি নিজের অজ্ঞাতে শিউরে উঠেছি। তারপর এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলুম। মা বলল— প্রণাম করিসনি প্রণাম করিসনি, এরা তো আমার থেকে এত কিছু পেয়েছে কেউ আমার কাছে নত হয় না। অথচ কবি অতবড় কবি বলেছেন—ওই চরণতলে মাটির পরে লুটিয়ে রব। মা গেয়ে গেয়ে বললেন, এখনও গলায় পরিষ্কার সুর, সামান্য দমের অভাব, সেটাও শরীরের ভঙ্গির জন্যে মনে হল। তার পরে বললেন—আমি এখন আসামি, অপরাধী, আমার বিচার হবে, বলতে বলতে হেসে উঠলেন। মায়ের এখন আশি বছর বয়স।

বিলদি মুখের একটা ভঙ্গি করল, উপেক্ষা বিরক্তি আবার সমীহ সবই তাতে মিশে আছে। মানুষের চোখ মুখ দেহের ভঙ্গি সব মিলিয়ে এমন এমন স্ববিরোধী ভাষা তৈরি করতে পারে যে তাবড় তাবড় ভাষাশিল্পীরা ভেবলে যাবেন। আমি তো কোন ছার। ফুলেশ্বরী আমার আরেক দিদি দেখলুম কেমন মিইয়ে বসে আছে। কেন বুঝতে পারলুম না। ফুল বরাবরই ছিল একটু

ডেলিকেট সুন্দরী। মহর্ষি বলতেন—এই যে আমার ইন্দুমতী, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান। ফুল খুব চুপচাপ, নিজের জগৎ, নিজের বন্ধুবান্ধব বইপত্তর নিয়ে কাটাত। ইংরেজিতে এম এ পাশ করেছিল বলে ওর আলাদা খাতির ছিল বাড়িতে, ওকে পড়াশোনার জন্য সময় আর ছুটি দিত বাড়ির সবাই। এটা কে করবে? না না ফুল নয়, ওর পড়া আছে। এইরকম। নীলদা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল, পলক ফেলছিল না। আমি বললুম —কী দেখছ নীলদা, চেনা যাচ্ছে না নাকি?

নীলদা বলল— তুমি না চেনালে পরে
কে তোমারে চিনতে পারে
চিনতে পারে তোরে তারা
যে তোমার চিন্তা করে।

গেয়ে গেয়ে বলল। এবং তখন একটা প্রবল শক খেয়ে আমি বুঝলুম— নীলদা স্বাভাবিক নেই। হয়তো একেবারে উন্মাদ পাগল নয়, কিন্তু যে কোনওদিন হয়ে যেতে পারে।

টুকাই নিচু গলায় বলল— নীলমামা আজ অনেক বচ্ছর ধরে কালী সাধনা করছে ছো মাসি। কেমন যেন হয়ে গেছে। খালি গান গায়, রহস্য করে কথা বলে।

আমি টুকাই-এর দিকে তাকাই। এতক্ষণ কেন ওকে দেখিনি? ছোটবেলায় যখন আমার চেয়ে মাত্র পাঁচ বছরের ছোট এই মা-মরা ছেলেটার মা ও বন্ধু হয়ে এক ধরনের মা-গিরিতে হাত পাকাচ্ছিলুম তখন একটা জিনিস আমাকে বড্ড লাগত, ওকে তখন জামাইবাবুর মতো দেখতে ছিল, এখন ও অবিকল বড়দির মতো হয়ে গেছে। সেই রকম চন্দনরঙা, তুলো তুলো ভাব গড়নে, চোখদুটো অনাবিল। ভেতরটা আমার দুঃখিনী, স্নেহময়ী, নিহত সেই গোলাপের জন্য হাহাকার করে উঠল, তার হত্যার প্রতিশোধ কেউ নেয়নি। সে হয় তো চায়নি, কিন্তু তার মা, বাবা, এতগুলো ভাইবোন, টাকা পয়সারও অভাব ছিল না, কেউ একটা লড়াই পর্যন্ত দিল না? তখন আমি খুব ছোট, নীলদা গজরাচ্ছে মনে পড়ল, মা বললেন, ফিরে তো পাব না! ছেলেটার কথাও ভাবতে হয়, একটা সুস্থ পরিবেশ! আসলে এদের কিছুতেই কিছু এসে যায়নি কোনওদিন, এসে যাবেও না, নিজেদের নিজেদের ছাড়া সব ব্যাপারে এরা ঘৃণ্যরকম

এসকেপিস্ট। মহর্ষি ক'দিন দরজা বন্ধ করে কাটিয়ে দিলেন, মোনালিসা কদিন মিটিং-টিটিং-এ গেলেন না। তারপর কবে যেন একদিন দরজা খুলে গেল, দরজায় পুরোনো মরিসটা এসে দাঁড়াল। জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ভাবে চলতে লাগল, শুধু আরেকজন শিশু যোগ হল গোঁসাইবাড়ির সংসারে।

আমি জিগগেস করলুম —টুকাই তোর বাবার কী খবর রে?

—ও তো মারা গেছে বছর ছয় কি সাত হল, ক্যানসার।

—আর তার স্ত্রী?

—সে তো অনেক দিন আগে বাবাকে ডিভোর্স করে, পয়সা টাকা মুচড়ে নিয়ে চলে গেছে। বাবার অসুখে চিকিৎসার টাকা ছিল না, কাকারাও দেয়নি, আমার আর কতটুকু সাধ্য বল, যতটুকু পারি করেছি। সব করার বার হয়ে গিয়েছিল।

ও দিক থেকে নেফারতিতি তেতো মতো হেসে বলে উঠলেন—একথা কেন? এ কথা কেন?

'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিবাইছে তব আলো

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?'

দুলদা বললে— বড্ড বাজে কথা হচ্ছে, খুকু বোস, বোস ভালো হয়ে। তোরা তো ওকে একটু জলটল খেতে দিলেও পারিস, অতটা দূর থেকে এল।

আমি থলি থেকে জল বার করে খাই, কোথায় বসব, কোথায় বসব? —মায়ের পায়ের দিকে মাটির ওপর বসে পড়লুম। এ মোড়া নিয়ে আসে, ও প্লাস্টিকের চেয়ার আনে, আমি নিজের জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে থাকি। স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট একটা, আর সবাইকে তো দেখতে পাচ্ছিই, নেফারতিতির মুখও স্পষ্ট, এটাই আমার ভালো করে দেখার দরকার। অন্যরা তো জলভাত। ইনিই আসল প্রহেলিকা।

এক প্লেট খাবার নিয়ে ফুলদি নীরবে এসে দাঁড়াল। বেশ বড় প্লেট। শিঙাড়া, কচুরি, আলুর দম, ছানার গজা, অমৃতি।

—বাপ রে বাপ, এত খাবার একসঙ্গে কখনও চোখে দেখিনি, মুড়ি পেঁয়াজ কাঁচালংকার অভ্যেস!

—বলিস কী রে? চারদিকে আজকাল এত খাবার এত খাবার, রেডি টু সার্ভ একেবারে, লোকে হামহাম করে খাচ্ছে, আর তুই এখনও সেই মুড়ি

পেঁয়াজে আটকে আছিস?—বিলদিটা চিরকাল বড্ড বোকা!

মা বলল— বুঝলি না ওটা আমাকে ঠাট্টা হল। ঠোকা যাকে বলে।

নীলদা বলল—আ-হহহ। এত জোর যে সবাই কেঁপে উঠল।

আমি একটা শিঙাড়া আলতো করে তুলে নিই, বলি— জলখাবার খেয়ে এসেছি। ফুলদির মুখটা দেখি বিবর্ণ হয়ে গেছে। কী ব্যাপার, ও এমন বিষণ্ণ কেন? অনেক কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। বিলদির উল্লাস, ফুলদির বিষাদ, দুলদার তাড়া, নীলদার অস্বাভাবিকত্ব ও যে আমাদের বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিল! বিশাল চাকরি করত বলেই তো জানি। সবচেয়ে কৃতী। ওকে কোনওদিন ঠাকুরদেবতা নিয়ে মাথা ঘামাতেও দেখিনি, যদিও ওটা আমাদের বাড়ির আবহাওয়াতেই ছিল। মহর্ষি তো ক্রমে জ্যান্ত ঠাকুর হয়ে উঠেছিলেন। তারকেশ্বরে লোকে যেমন ভোলেবাবার জন্যে যেত, তেমনি অনেকে মহর্ষির জন্যেও তো যেত! উপদেশ, পরামর্শ, মনের শান্তি, অসুখ-বিসুখ... একটা নাকি? আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক সবরকম। বিকেল চারটে থেকে ছটা, একেবারে ঘড়ি ধরে। সময় পার হয়ে গেলেই ময়না কোমর বেঁধে দাঁড়াত, যেমন এক এক করে ঢোকাত তেমন এক এক করে বারও করে দিত। আমরা— আমি, টুকাই, হাসতুম, ও হাসলে আমার ঠোঁটে আঙুল, আমি হাসলে ওর ঠোঁটে আঙুল। তখন ভুলদা নেই হয়ে গেছে। ভুলদা বেঁচে থাকলে বোধহয় আমার জীবনটা অন্য রকম হত, হতেই হত, কেননা জীবন ওইখানেই আমাকে একটা অপর্যাপ্ত মায়ায়, দায়িত্ববোধে বেঁধে দিয়েছিল। আমার মুক্তিসাধনের জন্যেই কি ভুল ভৈরবকে চলে যেতে হল? একেক সময়ে ভাবি, এক ঘায়ে ওপরের ভদ্রলোক আমায় আর ওকে দুজনকেই মুক্তি দিলেন। ভালো করেছেন, বিবেচকের কাজ করেছেন, না হলে এই ভুলভাল সংসারে ও বেচারি অবোধ কী করত, আর আমি, যে নাকি একটু বেশি বোঝে সেই আমিই বা কী করতুম?

—কী ব্যাপার তোমাদের, এত রহস্য করছ কেন? যা বলবার বলে ফেললেই তো হয়! আমিই বলি এবার।

লালদা ক্ষীণ স্বরে বলল— বুঝতেই পারছিস খুকু তোর বউদির চিকিৎসার জন্যে অনেক টাকা চাই...

—আমার একটা সংসার পড়ে আছে ডিব্রুগড়ে, অসুখ-বিসুখ লেগেই

আছে, ছেলেমেয়ের উচ্চশিক্ষা, মেয়ের বিবাহ তাও নিজের ক্ষমতার ভেতরে ধারধোর করেই দিলুম। কিন্তু কেন? আমাদের কি কিছু নেই? দুলদা বলল।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম— কিন্তু লালদা তোমাদের হেল্‌প করবার মতো এত টাকা তো আমার নেই! পাব কোথায়!

মনে মনে বললুম— দাদা দিদি ইত্যাদি হয়ে যে ভাবে আমাকে বিদায় করেছ, তারপর এই কথা আমাকে শোনাচ্ছ?

মা বলে উঠল--বুঝলে এবার মা? আসল কথাটি হল—

টাকা টাকা টাকা
নইলে জগৎ ফাঁকা।
টাকার সাহেব টাকার বিবি
টাকার কেনা গোলাম
টাকার ফাঁদে পড়ে মাগো
বেঁচে থেকেই মলাম।

নেফারতিতির ম্যমি মুখ শ্লেষে সামান্য বেঁকে গেছে।

—তুমি চুপ করো মা, অন্যায় করেও হেলদোল নেই —বিলদি বলল— জানিস খুকু, মা সমস্ত সম্পত্তি টুকাই আর চয়নকে আধাআধি দানপত্র করে দিয়েছে। চয়ন ওর মা-বাবার অমতে বেবুশ্যে বিয়ে করেছে জানিস না নিশ্চয়, তাকে ত্যাজ্য করবে না তো কী? সেই তাদের, আর লোক পেলে না। এদিকে বিজন তো কবে থেকেই শুযছে। ফুলেরই বা কী আছে? মা ফুলকে বাদ দেয় কী করে?

এতক্ষণে বুঝলুম ব্যাপারটা। —কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমি আশ্চর্য হয়ে বলি।

সবাইকার মুখে ছায়া নেমে এল। স্পষ্ট দেখতে পেলুম সেটা। শীতের বেলায় যেমন ঝপ করে সন্ধ্যা এসে পড়ে! ওরা কী ভেবেছিল? রামবোকা খুকু আসবে আর পরী-মা হয়ে ওদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেবে?

বিশ্বেশ্বরী

আমার বড়দিদি সেভাবে দেখতে গেলে আমার মায়ের বয়সি। তাঁকে আমি জন্মেই গিন্নিবান্নি দেখেছি। তিনি আমাকে দুধ খাইয়েছেন, আমাকে জামাকাপড় ছাড়িয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার দায় নিয়েছেন। প্রাক্-শৈশব কালের স্মৃতি যখনই হাতড়াই, বড়দির দৈবী মুখ মনে পড়ে। প্রত্যেক শিশুর কাছে মা তো ম্যাডোনা, তাঁর নরম শরীরের খাঁজে খাঁজে তার আশ্রয়, তার প্রথম প্রার্থনা, প্রথম ঈশ্বরানুভূতি। আমার ক্ষেত্রে সেই ম্যাডোনা ছিলেন বড়দি। তবে কি বড়দি বাপের বাড়িতেই থাকতেন! পরে তাঁর অকালমৃত্যুর পর বুঝেছিলুম আশপাশের লোকজনের কথাবার্তা থেকে যে তিনি শ্বশুরবাড়িতে খুব অত্যাচারিত হতেন। হয়তো তার থেকে মুক্তি পেতেই বাপের বাড়ি আসতেন। আমি বুঝি সেখানেও তিনি তেমন কোনও মানসিক আশ্রয় বা সান্ত্বনা পেতেন না। আমাদের মা ও বাবা দুজনেই দুরকমের ঠাকুর। সেই ঠাকুরবাড়িতে কারও আবাহনও ছিল না, বিসর্জনও ছিল না। কিন্তু বড়দি এসে দিনের পর দিন থাকতেন, যতদিন না শ্বশুরবাড়ি থেকে স্বামী হোক, দেওর হোক কেউ একজন নিয়ে যাবার জন্যে উপস্থিত না হত। এই সমস্ত সময়টা বড়দি এ বাড়ির যাবতীয় ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। আমি তো দুগ্ধপোষ্য, কিন্তু অন্য দাদা-দিদিরা এই কদিন একটু ভালো মন্দ খেতে পেত, সময়ে সব কিছু হত, মহর্ষি এসে বসতেন খাবার টেবিলে, একটা পারিবারিক সম্মিলন বলতে যা বোঝায়, তা ওইসব দিনগুলোতে হত। বড়দিকে সবাই ভীষণ ভালোবাসত। খালি দুজন বাদে। একজন আমার মা সুহাসদি-মোনালিসা-ম্যাডাম, অন্যজন বিশ্বেশ্বরী, বিলদি। মায়েরটা একরকম না-ভালোবাসা, বিলদিরটা অন্যরকম। মা খানিকটা উদাসীন থাকতেন—ও তাই নাকি? আজ পোস্ত দিয়ে এই মাছটা তুমি করেছ? খুব ভালো হয়েছে মা, তবে কি জানো, আমরা কেউই এদের বিলাসিতাতে অভ্যস্ত হতে দিতে চাই না। তোমার বাবাকে জিগগেস কোরো। প্লেন লিভিং হাই থিংকিং। তার মানে অবশ্য এই নয় যে একদিন তুমি পোস্ত মাছ, কি দই মাছ করতে পারবে না। আমায় ভুল বুঝো না যেন মা! সেটা ঠিক না, তাহলে আমি খুব দুঃখ পাব।

আমার দশ বছর বয়সে যাঁর মৃত্যু হয়েছে, তার সঙ্গে মায়ের কথাবার্তা কী হত না হত তা আমি কী করে জানলুম? জেনেছি, কেননা কেউ লক্ষ

না করলেও আমি বড়দির পায়ে পায়ে ঘুরতুম, আর কেউ অনুমান করতে না পারলেও আমি ছিলুম ভীষণ পাকা, অনেক কিছু লক্ষ করতুম, অনেক অসংগতি চোখে পড়ত, নিজে নিজেই তার কারণ খুঁজতুম, রীতিমতো গোয়েন্দাগিরি, খুঁজে বার করে তবে শান্তি।

—আচ্ছা ময়না, আমার যদি এখন একটা বাচ্চা হয়, আমি তো মরে যাব, তুই নিবি আমার বাচ্চাকে?

ময়না হেসে অস্থির, তোমার বাচ্চা? এখন? মাতাটা খারাপ হচ্চে বোধয়। এখন তোমার বাচ্চা হবার বয়েসই হয়নি।

—কেন? মার যে হয়েছিল?

—তোমার মার? এই ন বচরে? দূর খেপি!

—বারে, বড়দির থেকে তো মা মোটে দশ বছরের বড়।

—দূর তোমার মা কী জানো? বাব্বা, চেরযুবতি, তাই ওরম মনে হয়, আর বড়দিদি ভারিভুরি, মা মা মানুষটা, ধাত অন্যরকমের। যা শোনবার আমি শুনে নিলুম, কিন্তু আমি এও জানি বড়দি মায়ের চেয়ে দশ বছরের ছোট, কেননা কথাটা বড়দি নিজে একদিন মনের ভুলে বলে ফেলেছেন, মানে নিজের বয়সটা, আর বড়দি মিথ্যে বলবার লোক নন। ময়না আমাদের পোস্ট-তারকেশ্বর কালের লোক। তার আগেকার কথা তো ও কিছু জানে না, কিন্তু আমি জানি, জানাই যে আমার কাজ! আমি জানি, তার আগে বাবা নদীয়ার এস্টেটে কাজ করতেন, করতে করতেই কী করে টাকা করতে হয় শিখে যান, সেই সব দিনের কথা যে বড়দির কাছে কত শুনেছি, আমায় ঘুম পাড়াতে পাড়াতে, ভুলদাকে চাপড়াতে চাপড়াতে কত গল্প, কত! কত! একটা ছোট্ট মেয়ে মস্ত বড় দালানে একলা একলা খেলে বেড়াচ্ছে। উঁচুতে কড়িকাঠ ভূত কালো। কড়িকাঠের সঙ্গে পুতুল খেলছে, গঙ্গায় নাইতে যাচ্ছে, লুকোচুরি খেলছে। বাড়ির কড়ি-বরগা, জানলার পাট, দরজার খিল, গঙ্গার ঢেউ—এইসব ওর খেলার সঙ্গী। এই রূপকথার মধ্যে কোথাও মায়ের উল্লেখ পাইনি, যদিও বাবা ঘুরে ফিরে আসতেন।

আমার সেই ছোটবেলায় আমি যা কিছু শিখেছিলুম সব বড়দির কাছে। তিনি তো জানতেন না যে তিনি শেখাচ্ছেন, শেখাবার কথা সম্ভবত তাঁর মনেও

আসেনি। তিনি শুধু কর্ম করে যেতেন, কোনও ফলের আশা না করেই, গীতা থেকে তাঁকে এই অ্যাটিচুড পেতে হয়নি। ব্যাপারটা ছিল তাঁর স্বভাব, বা স্বধর্ম। শ্রেয় কিনা জানি না, কিন্তু এই স্বধর্মেই, বা এই স্বভাবের জন্যই তাঁর নিধন হল। তিনি কোনওদিন কাউকে জানাননি, কারও কাছে স্বামীকে নিয়ে কোনও অভিযোগ তোলেননি, সে লোকটাকে কোনওদিন সিধে করার চেষ্টা করেছিলেন কি না তাও আমার জানা নেই। স্বামীর চরিত্র সংশোধন করার পক্ষেও বোধ হয় তিনি ছিলেন বড্ড বেশি অভিজাত।

বড়দি অল্প তেলে মাগুর মাছ ছাড়লেন, তারপর ঢাকা দিয়ে দিলেন, আমি দাগা বুলোলুম। বড়দি বামনিকে নির্দেশ দিচ্ছেন ফোড়ন, মশলা সব বলে দিচ্ছেন, সবজিগুলো কীসের পরে কী ছাড়বে বলে যাচ্ছেন, বেগুন সব শেষে, ঢাকা দিয়ে দাও, না না জল দেবে না, তরকারির জলেই হয়ে যাবে। আমার কানে এখনও কে বলে যাচ্ছে। বড়দির কাছে যেমন রান্না শিখেছি, তেমন শিখেছি উদার মহৎ, শিখেছি সহবত, ভদ্রতা, এবং প্রতিবাদ, স্বাধীনচিত্ততা, শেষ দুটো অবশ্য বিপরীত বিহারে, কেননা বড়দির ওগুলোর অভাব ছিল। আর সমর্পণ? তাও শিখেছি বড়দিরই কাছে। যদিও তাঁর সমর্পণ আর আমার সমর্পণের জাত আলাদা। তবু আমার শিক্ষা তাঁরই সাপেক্ষে।

সবচেয়ে মজার কথা যে বড়দিকে সবচেয়ে হিংসে করত সেই বিলদির বিয়ে হয়েছিল স্রেফ বড়দিকে দেখে।

গল্পটা বলবার মতো! আমাদের বাড়ির কাছে যে কালী মন্দিরের কথা আগে বলেছি, সেটি জগদম্বা বা অশথ কালী বলে বিখ্যাত ছিল। নাকি খুব জাগ্রত। সেখানে পুজো দিতে আসেন উত্তরপাড়ার জমিদারদের কোনও শরিক বংশের গৃহিণী। তিনি বড়দিকে সেখানে দেখে মুগ্ধ অভিভূত হন। বড়দিকে জিগগেস করেন— সে কাদের কুলের মেয়ে, কাদের কুলের বউ। উত্তর পেয়ে জানতে চান তার কোনও বিবাহযোগ্যা ছোট বোন আছে কি না। এই পর্যন্ত। তার ঠিক দু দিন পরে ওই বাড়ির ম্যানেজার মশাই বাড়ির একমাত্র পুত্রের ফটো, বি এ বি এল পাশের সার্টিফিকেট, এবং আর সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য নিয়ে আমাদের বাড়ি এসে হাজির। মহর্ষিকে তাঁরা গাড়ি করে উত্তরপাড়ায় নিয়ে গেলেন। প্রচুর খাতির, খাওয়া-দাওয়া, পাত্রের সঙ্গে তার বাবা-মার সঙ্গে আলাপ-সালাপ, সব কিছুর অন্তে একটাই চাওয়া। তাঁদের মেজো মেয়েটিকে

একমাত্র ছেলের জন্য তাঁরা চান। বাবা তাঁদের মেয়ে দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তাঁরা দেখবেন না। গৃহিণী বললেন—আপনার বড়মেয়ে সাক্ষাৎ জগদম্বা, আমি মন্দিরের মায়ের আদেশ পেয়েছি এঁর ভগ্নী এঁর অংশ, এখন আপনি বলুন দু জনের মধ্যে চেহারার মিল আছে কি না। কথাটা সত্যি। সত্যিই বড়দির সঙ্গে বিলদির খুব মিল। তাঁরা ওই মেয়েকেই চান, একেবারে আশীর্বাদ করতে আসবেন। বাবা হেসে বলেন— মেয়ে যদি কানা কি খোঁড়া হয়?

গৃহিণী বলেন— হবে না, কিন্তু যদি তাও হয়, আমাদের কথার নড়চড় তো হবেই না, সে মেয়ে এ বাড়িতে দেবীর মর্যাদা পাবে।

এইভাবে অকল্পনীয় সমারোহে বিলদির বিয়ে হয়ে যায়। বাবা নাকি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে বিলদিকে ডেকে বলেছিলেন, মা তুমি যে তোমার দিদির যোগ্য বোন নও তা আমি সম্যক জানি! যে জীবন, ধনসম্পদ, সমাদর পেতে যাচ্ছ তা তোমার দিদির উপহার, জেনো। তার মুখ, আমার মুখ কোন কারণেই হাসিও না। তুমি যা নও, তা হতে যদি নাও পারো অন্তত হতে চেষ্টা কোরো, তাও না পারলে হবার ভান কোরো, মরা মরা বলতে বলতে যদি রাম হয় তাহলে ভান করতে করতেও তুমি সত্যে পৌঁছে যাবে। আমায় কথা দাও, নইলে বল আমরা ফুলেশ্বরীর সঙ্গে এ পাত্রের বিয়ে দেব, একটু বয়সের বেশি তফাত হবে, ফুল পড়াশোনা শেষ করতেও খুব আগ্রহী, কিন্তু সে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কথা দিয়ে যাও, নিজের মাথায় হাত রেখে শপথ করো, তবেই আমি এ রিস্ক নেব।

বিলদি কথা রেখেছিল। শ্বশুরবাড়িতে বোধ হয় সংযত হয়ে থাকত, বাপের বাড়িতে এসে নিজ মূর্তি ধারণ করত।

আয়রনি হল—আসল জগদম্বা অগ্নিদগ্ধ হলেন, খুন হয়ে গেলেন অসুরের হাতে, নকল জগদম্বা ময়ূর সিংহাসনে বসে রাজত্ব করে গেলেন এবং আমার মায়ের সিংহভাগ গহনা আদায় করে নিলেন, অভাবে নয়, স্রেফ স্বভাবে।

বাবার ওই ওয়ার্নিং-এর কথা আমি কী করে জানলুম? আমি তো তখন পুঁচকে একটা। নিমন্ত্রিতদের গোলাপ ফুলের বোকে দিচ্ছিলুম, আর তারা

আমার গাল টিপে দিচ্ছিল।

না গল্প বানাচ্ছি না। বাবা আমাকে স্বয়ং বলে গেছেন যেমন অনেক কিছুই নিজের নীরব হৃদয়ের গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে বলতেন।

একটা সময় এসেছিল, যখন দীর্ঘ দিন বাবা শয্যাগত ছিলেন, তখন মা থাকতেন তাঁর পাশে, আর আমি। তবে আমাকে মাকে পালা করে থাকতে হত, কারণ সংসার চলবে কী করে? বিলদি, ফুলদির বিয়ে হয়ে গেছে, লালদা খড়দায় সংসার পেতেছে, নীলদা কেরিয়ার নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত, দুলদা আর পাঁচজনের মতোই দায়িত্বজ্ঞানহীন। এদিকে যখন তখন বাবাকে দেখতে লোকজন এসে পড়ে, দিদিরাও আসে সদলবলে, আবার চলে যায়। কে বাজার করবে, র‍্যাশন তুলবে, ব্যাংকে যাবে, চা করবে, এইসব বিশেষ করে বাইরের কাজগুলো করতুম আমি। তখন বাবার সঙ্গে কত কথা হয়েছে।

বিলদি গহনা শাড়ি ঝলমলিয়ে বাপের বাড়ি আসত। ফুলদির সঙ্গে খুব ভাব। দুজনে গল্প করত। আমি একটু বড় হতে না হতেই ওদের কথা শুনতে লেগেছি। ওরা আমাকে খেয়াল করত না, কিন্তু আমি সব বুঝতে পারতুম। বিলদি বলত —দ্যাখ না ফুল তোরও কেমন ভালো বিয়ে হবে, আমার মতো এতটা হয়তো নয়, কিন্তু খেয়ে পরে শাড়ি গয়নায় মুড়ে থাকবি। এদের ফ্যামিলিতেই দেখি না হয় কি না। তবে কি জানিস এই সব বনেদি বাড়ি রূপ বলতে সলিড রূপ বোঝে। রং হবে দুধে-আলতা, চুল হবে পিঠ-ছাপানো, কুচকুচে কালো, টানা ভুরু, বড় বড় চোখ, নাক যেন উঁচু হয়ে থাকে—হিরের নাকফুল পরা মুখটা একটু ফেরাল বিলদি অমনি ঝলকে উঠল মুখ। তোরা কী জানিস তো! ফঙ্গবেনে। ফনফনে শরীর, সাদাটে রং, কোমর বুক সবই এতটুকু টুকু মাপের, চুল কটাশে, ঠাহর করে দেখলে তবে বোঝা যায় মেয়েটি সুন্দরী।

ফুলেশ্বরী তখন সবে কলেজ যাচ্ছে, তার চারদিক ঘিরে কত স্তাবক, তার এ সব কথা ভালো লাগবে কেন?

সে হেসে বলল— তা যদি বলিস বিলদি তোকে তো না দেখেই তোর শাশুড়ি বিয়ে দিলেন, স্রেফ বড়দির পরে তোর বিয়ে। কী একখানা দিদি পেয়েছিলি, ভাব।

বিলদি মুখ ঝামটে উঠল— বাজে বকিসনি, আমি যা পেয়েছি আমার ভাগ্যে। ও সব দিদি-ফিদি বাজে।

—দিদি-ফিদি? বাজে? বড়দির সম্বন্ধে এ ভাবে কথা বলছিস?

বিলদি মুখ বেঁকিয়ে বলল—সতাতো দিদি আবার দিদি! তার আবার ভালো-মন্দ, তার আবার পয়!

—ইসস, কী অকৃতজ্ঞ রে তুই? বড়দি কী ভাবে আমাদের করে বল তো? ও রকম স্নেহ আমরা কি মা বাবার কাছ থেকেও পাই?

বিলদি একটা উচ্চাঙ্গের হাসি দিল— কেন করে বল তো?

—এর আবার কেন কী? মানুষটাই অমনি।

—ছাতার মাথা! ট্রাই এগেন।

—সৎ সেটা বুঝতে দিতে চায় না, না কী?

—আরেকটা চান্স দিচ্ছি।

—ধ্যাৎ, ফুল বলল, তোর মনটায় জিলিপির প্যাঁচ!

—কীসের প্যাঁচ বুঝবি পরে।

—কী বলতে চাইছিসটা কী?

—বড়দি বাবার সম্পত্তির অন্তত আর্ধেকটা না নিয়ে ছাড়বেই না।

ফুলদি বলল— তাই? দুর আমার বিশ্বাস হয় না। আর চাইলে তো চাইতেই পারে। ওর তো দাবি আছে। বিয়েটাও একদম ভালো হয়নি, বড়দির খুব কষ্ট রে!

একটা বয়স আসে যখন মানুষ শরীরে মনে বড় হয়ে উঠছে। আবছা ভাবে আন্দাজ করছে পৃথিবীর, জীবনের বিরাটত্ব, জীবনধারণের গভীর আনন্দ, ফুলেশ্বরীর তখন সেই বয়স বোধ হয়, সে বড়দিকে করুণা করল, টাকা-পয়সা নিয়ে ভাবল না, উদার হতে তাকে কোনও চেষ্টা করতে হল না।

বিলদি রাগ করে উঠে গেল। আমি নতুন শব্দটা নিয়ে জিবে লোফালুফি করতে শুরু করে দিলুম। সতাতো সতাতো সতাতো।

ঘুরছি ফিরছি বলছি— সতাতো সতাতো সতাতো।

—কী বকবক করছিস রে খুকু?

আমি চুপ। জানি না, কথাটার মানে জানি না, খুব গর্হিত কথাটা, কোনও এক সময়ে চুপিচুপি জেনে নেব।

তবে বড়দির ছায়া বিলদিকে চিরটা কাল অনুসরণ করেছে। বা অন্যভাবে বলতে গেলে বিলদি চিরকাল বড়দির ছায়া হিসেবে পরিচিত রয়ে গেল। পরমেশ্বরীর বোন? তাই বল, ও তো দেখলেই বোঝা যায়। বিলদির সেই শাশুড়ি এখনও বেঁচে, এখনও বিলদি তার খোলস ছাড়তে পারে না। দিনের মধ্যে একবার করে অন্তত পরমেশ্বরীর নাম তাকে শুনতেই হয়। আর এমনই আয়রনি যে বড়দি তার পিতৃসম্পত্তির হাফ কোনওদিনই চাইতে এল না। কিন্তু বড়দির ছেলে টুকাই তা অনায়াসে পেয়ে গেল তার সৎ দিদিমার কাছ থেকে, যা নিয়ে আজ পুরো গোঁসাই পরিবারে এমন ঝড় উঠেছে। লিড দিচ্ছে সেই বিলদি। ও জানে ও এত ধনী, এত ধনী যে বাপের বাড়ির সম্পত্তির ভাগ চাইলে ওকে সবাই ছি ছি করবে, ওর শাশুড়ি বা বর তো ভাবতেই পারবেন না, তাই ও এখন লাল-নীল-ফুল-দুলদের হয়ে কোমর বেঁধেছে।



টুকাইকে এখন বড়দির ছেলে বলে স্পষ্ট চেনা যায়। ও কি বড়দির স্বভাবটা পেয়েছে? বড়দির মতো দেখতে তো বিলদিও। আসলে দুজনেই বাবার মতো। এই নাতিও দাদুর চেহারার ধারা পেয়েছে। কিন্তু মহর্ষি ছিলেন ঝাড়া ছ ফুট লম্বা। টুকাই ওর বাবার মতো বেঁটে।

ও বলল— আচ্ছা ছোমাসি, দিদাই যদি আমাকে দেয়, সে কি আমার দোষ?

আমি বললুম— আগে তোমরা বলো আমাকে এর ভেতরে ডাকলে কেন?

বিলদি বলল—তোরও তো একটা ন্যায্য পাওনা থাকে!

লালদা তাড়াতাড়ি বলে উঠল-- টুকাই তোর কথা শোনে।

দুলদা বল--- মা-ও তোকে মানে!

ফুলদি ক্ষীণ গলায় বলল— খুকু তুই চিরকাল ন্যায্য কথা বলে এসেছিস।

—আ—হহ— বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল নীলদা।

সবাই এক মুহূর্ত চুপ। তারপর লালদাই বিরক্ত গলায় বলল— কী চাস তুই? অ্যাঁ? কী চাস শুনি? ভালো না লাগে এখান থেকে বেরিয়ে যা, যা বাইরে গিয়ে তোর আহ ওহগুলো কর। দিস ইজ টূ মাচ। টূ মাচ।

আমি বললুম— নীলদা তুমি কি আমার এখানে থাকা নিয়ে অসন্তুষ্ট? আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। সেক্ষেত্রে আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। কিন্তু

তুমিও তো আমায় ফোন করেছিলে?

নীলদা একটা মোড়ার ওপর জোড়াসনে বসেছিল। দুদিক থেকে বলিষ্ঠ হাঁটুসুদ্ধু অনেকটা করে পা বেরিয়ে ছিল। এবার পা দুটো নামিয়ে সামনে ঝুঁকে বসল, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গলায় বলল— নাটক দেখতে ডেকেছিলুম। তুমি নিজে নিজে অনেক কিছু অ্যাচিভ করেছ, সেগুলো তো কোনও গুরুঠাকুর এসে করে দিয়ে যাননি। তোমাকেই মাথা খাটাতে হয়েছে। তার বিন্দু প্রমাণ খরচ করে এই কেঅসকে অর্ডারে নিয়ে আসতে কেউ পারলে তুমিই পারবে। দ্যাখো। —বলে নীলদা একটা লম্বা বিড়ি ধরিয়ে বাইরে চলে গেল।

—তোমাদেরও কি এটাই মত? আমি জিগগেস করি।

—তোমার মতামত শুনি আগে —লালদা বলল।

—আমি গোটা ব্যাপারটার মধ্যে একটা পোয়েটিক জাস্টিস দেখতে পাচ্ছি। আমি আস্তে আস্তে বলি। —বড়দি আমাদের প্রথম মায়ের মেয়ে। দুই মায়ের যদি দুই ভাগ হয়, সেটাই হওয়া উচিত, তাহলে টুকাই বড়দির উত্তরাধিকারী হিসেবে অর্ধেকই পায়। মা নিশ্চয় সেই ভেবেই এই ভাগটা করেছে। বাকি অর্ধেকটা আমাদের সবার মধ্যে ভাগ হওয়ার কথা। ফুলদিরা ত্যাগ করায় চকাইটা বোধ হয় খুব অসুবিধেয় পড়েছে, তাই মা এই ব্যবস্থা করেছে মনে হয়, মা চিরকালই খুব উদার ভাবে, সময়ের থেকে এগিয়ে ভাবতে পারে।

পুরো ঘরটা এক লহমায় চুপ, একদম চুপ হয়ে গেল। পাখার আওয়াজ ছাড়া আর কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। অবশেষে টুকাই ভারী গলায় বলল— এটা সত্যি দিদাই, তুমি আমার নিজের দিদাই নও?

লালদা অপ্রস্তুত গলায় বলল— এতদিন পরে এ কথাটা না বললেই হত না? এ কী রকম বুদ্ধি আমি জানি না বাবা।

আমি দৃঢ় গলায় বলি।

—খুব ছোটবেলায় এ কথা শুনে আমার মনটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল লালদা, বড়দি আমাদের বড্ড ভালোবাসত, তার জন্য আমরা কিচ্ছু করিনি। কিন্তু টুকাই ছেলেমানুষ নয়, ছেলের বাবা হয়ে গেছে, মা ওর নিজের দিদাই না হয়ে ওর ক্ষতিটা কী হয়েছে? ও তো আমাদের কাছেই মানুষ হয়েছে, মায়ের কাছে যথেষ্ট আদর পেয়েছে। তফাতটা কী হল? ও কি এখন নাটকের

বাচ্চার মতো কাঁদতে বসবে নাকি? বড়দি, বাবা, মা কেউ যে, জিনিসটা আমাদের জানতে দেননি, সেটা কি আমাদের গুড উইলের যথেষ্ট প্রমাণ নয়? টুকাই, ন্যাকামি করিসনি প্লিজ।

টুকাই ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল—না তা নয়, ইটস এ রেভিলেশন। সবাই জানত, আমি একাই জানতুম না? ছোমাসি যখন আমরা একসঙ্গে খেলতুম, তুমি জানতে?

—না, একটু পরে জেনেছি, অ্যাকসিডেনটালি, কেউ আমাকে বলেনি। আমার মতামত তোমরা জানলে। এখন বোধ হয় আমি যেতে পারি!

আমি ডিভানে সিংহ শয়নে শোয়া নেফারতিতির দিকে এগিয়ে যাই। উনি উঠে বসেন, আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি, বলি—আসি তাহলে? উনি সবাইকে সচকিত করে গেয়ে উঠলেন— আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন তোমাতে করিব বাস/দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস... তারই মধ্যে দিয়ে আমি বেরিয়ে এলুম। বাইরে নীলদা, মাথায় একটা হাত রাখল, বলল— বেঁচে থাকো, ভালো থাকো। এরা তোমাকে অত সহজে ছাড়বে না।

—কী হয়েছে তোমার, নীলদা!

—কিছু তো নয়!

—হঠাৎ তুমি কালীসাধনা শুরু করলে?

—কালীসাধনা আমরা সবাই করছি খুকু কোনও না কোনও ফর্মে।

—তুমি ভালো আছ তো?

—ভালো থাকারই তো কথা। বিয়ে করিনি, ফ্যামিলি নিয়ে হাজার গন্ডা ফ্যাচাং নেই। নিজেরটা নিজে চালিয়ে নিতে পারি। আবার কী লাগে মানুষের ভালো থাকার জন্য?

ফিরতে ফিরতে ভাবতে লাগলুম—নীলদা কি অভিনয় করছে? চোখের চাউনি অমন বদলে যায় কী করে? আমি নীলদাকে কতদিন দেখিনি, আমার চলে আসার সময়ে ও কোথায় ছিল? কোথায় যেন? হায়দরাবাদ কি? নিজের ভেতর থেকে কোনও উত্তর এল না। তাহলে কি কোনওভাবে আমি নীলদাকে মিস করেছি? কোনও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়? ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয় যে জীবনে সব সময়ে অঙ্ক মেলাবার জন্যে আমরা সমস্ত সূত্র পাই না,

পাব না, ত্রুটি থেকে যাবে, এটা মেনে নিতে কষ্ট হয়, কিন্তু নিতে হবে। আমি শতকরা শতভাগ ঠিক এ অভিমান আমাদের শেষ অবধি টেকে না।

এত তাড়াতাড়ি আমাদের মিটিং শেষ করে দিতে পারব আমি আশা করিনি। কিন্তু মানুষগুলোকে অনেক দিন পর দেখলুম, এরা সব আমার নিজের রক্তমাংস। মনের মধ্যেটা একটা কী রকম কী রকম করছে। স্বস্তি পাচ্ছি না। মা কেন গাইল— তোমার বিরহে...। এই ভদ্রমহিলা অনর্থক কখনও কিছু করেন না। আমার সমর্থন কি ওঁর অভিপ্রেত ছিল? নীলদাই বা কী চায়? দুজনে মিলে তো দেখছি হেঁয়ালি ডবল করে দিল! সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে কী হয়? প্রায় বিশ বছর আমি ওখান থেকে চলে এসেছি। একটা দূরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল বলে জানতুম। আমার এখনকার জীবনে ছোট ছোট জিনিস নিয়ে এই অহেতুক হেঁয়ালি নেই। ভীষণ অস্বস্তি লাগতে থাকে। এঁরা কে? এই মা, এই নীলদা! কী বলতে চায়?

সেল ফোনটা বেজে উঠল এই সময়ে। একটা অচেনা নম্বর। হ্যালোওও। ওদিক থেকে একটা অচেনা গলা বলে উঠল— ছোমাসি, তুমি কোথায়? আমি মেট্রোর তলায় যদি দাঁড়াই, একবার দেখা করতে পারবে?

—তুমি আমার নম্বর কোথা থেকে পেলে?

—ভাইয়ের থেকে, ছোমাসি প্লিইজ।

—চয়ন, আমি এখন খড়দা থেকে ফিরছি, ট্যাকসিতে, মেট্রো পৌঁছতে কতক্ষণ লাগতে পারে, ধরো, এক ঘণ্টার কাছাকাছি?

—সে কি? তোমাদের মিটিং হয়ে গেল?

—হ্যাঁ।

—কী হল?

—এ সব কথা ফোনে হয় না। তার চেয়ে তুমি আমার বাড়ি চলে এসো, তখন কথা হবে।

—আমি এখন অফিস থেকে বলছি। যেতে যেতে ছটা সাড়ে ছটা হয়ে যাবে।

—মেট্রোর তলায় দেখা করবার কথা বলছিলে যে?

—আমি ভেবেছি, সারাদিন ওখানে কাটিয়ে তুমি বিকেলের দিকে ফিরবে,

তখনই একটু দাঁড়িয়ে যাবে, আমার অফিস সুরেন ব্যানার্জিতে, টুক করে চলে যেতাম।

—তা হয় না, আমি এখন বাড়ি ফিরছি। তুমি অফিস ফেরত আমার বাড়ি চলে এসো।

বাড়ি ফিরছি বললুম বটে, কিন্তু তক্ষুনি তক্ষুনি আমি বাড়ি ফিরলুম না। একটা দোকান থেকে স্যানড্উইচ আর কফি খেয়ে চলে গেলুম গোলপার্ক লাইব্রেরি। সকালবেলার ঘটনাটাকে মুছে ফেলে দিতে পারে এমন কিছু আমার করার দরকার ছিল। ভুলে যাও খুকু, ভুলে যাও। বেঁচে থাকো নিজের গড়া ওই বর্তমানে। সারা দুপুর কাজ করলুম। পোড়ামাটির কাজের ওপর লেখাটা শুরু করে দিলুম। এখানে, এই পরিবেশে লিখতে আমার সবচেয়ে সুবিধে হয়। এখন টাটকা টাটকা সব মনে আছে, নোট পর্যন্ত লাগছে না। যেটুকু দরকার হচ্ছে ব্ল্যাংক রেখে যাচ্ছি। লিখতে লিখতে যখন একেবারে মগ্ন হয়ে গেছি, সব ভুলে গেছি, খড়দা, তারকেশ্বর, নেফারতিতি, চয়ন ইত্যাদি ইত্যাদি তখনই হঠাৎ ঢেউটা এল। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে কিছু একটা, আমি তাকে কিছুতেই বেরোতে দিতে চাই না। তাই সে আরও দুর্দম হয়ে উঠেছে। গলা ব্যথা করছে, শরীর আনচান, কী সর্বনাশ! আমি কি এইখানে একটা পাবলিক প্লেসে অসুস্থ হয়ে পড়ব নাকি?

কোনওক্রমে উঠে দাঁড়াই, টলতে টলতে বেরিয়ে যাই, কোথায় বাথরুম? কলঘর কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না কিছু। কোনওক্রমে হাতড়ে হাতড়ে বাথরুম, দরজাটাও ভালো করে বন্ধ করতে পারি না। তারপর বেসিনের ওপর উপুড় হয়ে পড়ি। বেরিয়ে আসে বাদলধারার মতো অশ্রুধারা। চোখমুখ ভেসে যাচ্ছে, তিরিশ বছরের জমা কান্না উনুনে দুধের মতো, সাগরের ব্রেকারের মতো উথলে উথলে বেরিয়ে আসতে থাকে। আমি কাঁদতে থাকি— বড়দি! বড়দি! ও বড়দি গো! একবার ফিরে এসো, আমার মাথায় হাত রাখো, একটিবার বড়দি, আর কখনও চাইব না, আমরা সবাই মিলে তোমাকে মেরে ফেলেছি বড়দি, আমি আর সইতে পারছি না, তোমাকে সবাই ভুলে গেছে পরমেশ্বরী, এ-ও আমার সহ্যের বাইরে। হেঁচকি তুলে তুলে আমি কাঁদতে থাকি, একেবারে প্রাকৃত জনের মতো। বহুক্ষণ হুঁশ ছিল না। দরজায় সামান্য টোকা, লজ্জা পেয়ে দরজা টানি, বন্ধ ছিল না। বাইরে একটি বিদেশি যুবক

দাঁড়িয়ে। —ইজ এনিথিং রং? ক্যান আই হেলপ ইউ? —নীল চোখে করুণা, উদ্বেগ।

আমি কোনওক্রমে মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসি, মাথা নাড়ি— না না আমার কিছু হয়নি।

—য়ু মাস্ট বি ফিলিং সিক। ক্যান আই সি য়ু হোম?

লাইব্রেরি থেকে খাতাপত্র গুছিয়ে নিয়ে আসে যুবকটি কেমন উদাস অথচ আন্তরিক, একজন প্রচণ্ড দায়িত্বশীল মানুষ, যেন আমার জন্যে কেউ তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাকে তার পেছন পেছন যেতে সে বাধ্য করে, ট্যাকসি ডাকে, মাঝপথে ট্যাকসি থামিয়ে একটা হোমিওপ্যাথি দোকান থেকে কী যেন ওষুধ নিয়ে আসে, আমাকে খাওয়ায়, বলে ইট উইল ডু য়ু আ লট অব গুড। বিনা আপত্তিতে আমিও খেয়ে নিই। গ্রিন পার্কে আমায় নামিয়ে দিয়ে ওষুধটা ও হাতে দিয়েও দেয়, আমি বাড়িতে ডাকলে সবিনয়ে জানায় ওর দরকারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, সাম আদার ডে। এবং আমি ঘরে এসে শুয়ে পড়বার সময়ে কৌতূহলবশে ওষুধটার নাম দেখি—ইগনেশিয়া থার্টি। শোকের ওষুধ।

ফুলেশ্বরী

আমি ছাড়া একমাত্র ফুলদিই বোধ হয় বড়দিকে ভালোবাসত, আরও ভালো করে বলতে গেলে, বড়দির মর্ম বুঝত। বিলদি তাকে যা-ই বলুক, ফুলদিই ছিল আমাদের বাড়ির ভেতরে প্রকৃত সুন্দরী। শুধু বড় বড় চোখমুখ, দুধে আলতা রং, এ সব হলেই তো সুন্দর হয় না, এ সবের সঙ্গে একটা ভাব চাই। বিশ্বেশ্বরীর সব কথা সত্যি। ফুলদি তন্বী, তার রং ফরসা হলেও নম্র নরম, পেয়ারার শাঁসের মতন। তাকে হঠাৎ দেখলেই চোখে পড়ে না, সে আস্তে আস্তে দৃষ্টির দিগন্তে জেগে ওঠে শুকতারার মতো। আমি নিজেও ফুলদিকে এমনি ভাবেই আবিষ্কার করেছি। যাচ্ছি পাড়া নাটকের রিহার্সালে, ফুলদি ট্রেন থেকে নামল, আমি তাকে ফুলদি বলে বুঝিনি, দেখলুম একটি ফুলন্ত সজনেগাছের শাখা নামল। বাব্বা, আমাদের তারকেশ্বরে এ কে এল? এমন নয়ন-ভুলানো, হৃদয়-ভুলানো?

কী রে খুকু? এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে? কেউ আসবে?

না না আমি দুনিদাদের বাড়িতে রিহার্সালে যাচ্ছিলুম ফুলদি, দেখতে পেলুম তুমি কী সুন্দর নামছ!

কী সুন্দর নামছি? তুই এমন অদ্ভুত করে কথা বলিস! ফুলদি হেসে ফেলল।

ফুলদি পাশের পড়া করতে খুব ভালোবাসত। ভালো ভালো রেজাল্ট করত। কিন্তু পাঠ্যের বাইরে আর একটা বইও পড়ত না। কেন আমি জানি না।—ফুলদি আমাকে 'টেল অব টু সিটিজ' বইটা দেবে? সিনেমা হচ্ছে, আমি যাব, যাতে ভালো করে বুঝতে পারি, তাই বইটা পড়ে নেব। উত্তরে ফুল আমাকে বলল—ওটা থাকবে কী করে? ওটা তো আমাদের সিলেবাসে নেই?

—তাহলে গল্পটা একটু বলে দাও।

—দূর, বলছি সিলেবাসে নেই। ওই ফ্রেঞ্চ রেভলুশনের সময়ের ডামাডোল নিয়ে। বাস, এর থেকে বেশি কিছু ওর কাছ থেকে আমি জানতে পারলুম না। সাহিত্য নিয়ে পড়ে কেন লোকে? সাহিত্য পড়বে বলেই তো!

ফুলের মুখ সব সময়েই একটু আচ্ছন্ন থাকে। ও কি কোনও ভাবনার মধ্যে থাকে? তা-ও তো টের পাই না। তারপর এম এ পাশ করতে না করতে ফুলের বিয়ে হয়ে গেল। অলকদা ছিলেন, ওদের ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। ভালো পাত্র। বাবার খুব পছন্দ হয়েছিল, মায়েরও। খালি বিলদির হয়নি, সে উঠে পড়ে লেগেছিল তার মামাতো দেওরের সঙ্গে বোনের বিয়ে দিতে। কথায় কথায় মুখ বেঁকাত—হিস্টরির মাস্টার, দিন আনবে দিন খাবে, ফুল তোর অমন আগুনের মতো রূপ, তোকে না দিতে পারবে একটা ভালো শাড়ি, না একটা গয়না। আমরা তো বছরে তিনবার বেড়াতে যাই, তোকে ওই মাস্টার বর একবারও ঘোরাতে পারবে? শুনতে শুনতে ফুলদির মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, অলকদার ওপর রাগ হয়ে যাচ্ছিল। মামাতো দেওরের সঙ্গে ফুলকে ভিড়িয়ে দিল বিলদি। ফুল দিদির বাড়ি গিয়ে অনেক দিন থাকল, আর সেই অবসরে বিলদি মামাতো দেওর বিজন চক্রবর্তী, বিজনেসম্যানের সঙ্গে ওর প্রেম জমিয়ে দিল। বিজনদার তখন বৃহস্পতি তুঙ্গে, খুব রোজগার করছে, গাড়ি নিয়ে ফুলকে আজ এই সিনেমা, কাল ওই রেস্তোরাঁ, মাঝে অবশ্য বিশ্বেশ্বরী আছেন ঠিক। সেই বিজনদার সঙ্গেই ফুলদির বিয়ে হয়ে গেল। অলকদা আসেননি, পুরো সেট টমাস হার্ডি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা পরে

আমার কাজে লেগেছিল।

মানুষের ভাগ্য একটা অদ্ভুত জিনিস। প্রথম দিকটা ফুল ভালোই ছিল, কিন্তু ব্যবসার ওঠা পড়া আছে, লাভ লোকসান আছে, পরের দিকে শুনেছি ক্রমশই বিজনদার ব্যবসা মার খায়। উনি সরকারকে কেব্‌ল সাপ্লাই দিতেন। জাপান থেকে কী নতুন প্রযুক্তি এল, আরও সস্তায় ওরা সেটা দিতে লাগল, বিজনদা বহু টাকার লোকসান খেয়ে গেলেন, শিরদাঁড়া ভেঙে গেল। এটা ওটা করে তারপর থেকে চলেছে। কিন্তু কোনওদিনই আর ঝেড়েঝুড়ে উঠে দাঁড়াতে পারেননি। অলকদা বরং রিডার হলেন, প্রোফেসর হলেন, তারপর বিদেশে বড় চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। এখন তিনি হিস্টরির জগতে বেশ একটা নাম। হিস্টরি কংগ্রেসে আরও অন্য অন্য কনফারেন্সে পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছেন, সঙ্গে থাকছেন ওঁর স্ত্রী, ফুলদির সহপাঠিনী সংযুক্তাদি।

ফুলদিকে এর জন্য মায়ের কাছে কথা শুনতে হয়েছে। ফুলদি উদাস চোখে বলত—মা, বোঝাই যাচ্ছে আমার সেই শ্রীবৎস-চিন্তার চিন্তার ভাগ্য, হাত থেকে পোড়া শোল মাছ জ্যান্ত হয়ে পালিয়ে যায়। আমি যদি অলকদাকে বিয়ে করতুম তাহলে হয়তো ওর আর এ সব হওয়া হয়ে উঠত না। ডিমোশন, আরও ডিমোশন হয়ে অলকে-বিজনে একাকার হয়ে যেত।

—মা শুধু বলেছিলেন--তুমি যে তাকে আশা দিয়ে ফিরিয়ে দিলে ফুলেশ্বর, দিদির কথায় নাচলে, লোভে পড়ে গেলে, লেখাপড়ায় অত ভালো একটা অধ্যাপক ছেলে হাজার দুর্গতি হলেও তো আর মূর্খ হয়ে যেতে পারে না। লোভ জিনিসটাই তোমার ক্ষতি করল।

আসলে, ফুল ছিল মায়ের সবচেয়ে প্রিয় মেয়ে। দেখতে মায়ের সঙ্গে মিল। মা হয়তো তাকে নিজের প্রোটো-টাইপ মনে করতেন। ভাবতেন এ-ই তাঁর উত্তরাধিকার বহন করবে। তাই তাকে পড়াশোনার সমস্ত সুযোগ সুবিধে দিলেন, স্বাধীনতা দিলেন। যেই সে ভালো রেজাল্ট করতে লাগল মায়ের বুক গর্বে ফুলে উঠতে লাগল, যে সুযোগ তিনি পাননি, পেলে পৃথিবী জয় করে ফেলতে পারতেন বলে তিনি মনে করতেন, সেই সুযোগ পেয়ে তাঁর ফুলেশ্বরী সুহাসতর হয়ে উঠবে, এমনটাই ছিল তাঁর আশা। যদিও মা নিজের জায়গায় অন্য কাউকে দেখতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন কি না আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মায়ের মধ্যে যথেষ্ট কর্তৃত্ববোধ, আত্মপরতা, এমনকী সূক্ষ্ম

হিংসা আমি পড়তে পারতুম। তবু, তবু যদি উত্তরাধিকার দিয়ে যেতেই হয়, ফুল একমাত্র ফুলকেই তা দেবেন তিনি ভেবে থাকতে পারেন। হায়, ফুলের মধ্যে তাঁর একটা বাহ্যিক সাদৃশ্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমার দুঃখ হয়, ফুলের জন্যেও, মোনালিসার জন্যেও। সেই দুঃখের মধ্যে একটু ছোট্ট হাসি মিশে থাকে। কার জিন যে কোথা থেকে বেরোয়! বোতল থেকে ঘড়া থেকে, রূপকথা তো তাই-ই বলে।



আকাশ এখন মেঘে ঢেকে গেছে। আমি খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। একটা প্রকাণ্ড ঝড় আসছে। এই ঝড় আমার সমস্ত জীবন ওলোট পালোট করে দেওয়া সেই ঝড়ের মতো যদি হয়? যদি হয় তেমনি বৃষ্টিহীন চোখ-রাঙানো লাল টকটকে ধুলোর ঝড়? বাবা মারা যাচ্ছেন, যে বাবার সঙ্গে ছোট থেকেই আমি গীতা-গীতবিতানের সূত্রে বাঁধা ছিলুম, কিন্তু তাঁর চার বছর বিছানায় পড়ে থাকার সময়ে যাঁর সাংসারিক, বৈষয়িক, ব্যক্তিগত দিকগুলোর সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘন হয়েছিল! বাবা যিনি প্রচুর উপার্জন করেছেন, কাউকে তা শিখিয়ে যেতে পারেননি, মহর্ষি যাঁর কাছে পরামর্শ চাইতে দূর দূরান্ত থেকে লোক আসত, কিন্তু তাঁর সন্তানরা কখনো আসেনি, বাবা যিনি দার্শনিক, অথচ প্রবৃত্তিতে অতি সাধারণ। বাবা তখন আমার হাতে খান, মায়ের হাতে চান করেন, তাঁর কাপড়চোপড় বিছানাপত্তর এ সবের ভার ময়নার।

বাবা বলছেন— ময়নাকে তুমি ছাড়িয়ে দাও সুহাস, আমি আর ওকে সহ্য করতে পারছি না।

মা বললেন— এতদিন দরকারের সময়ে সেবা নিয়েছ এখন সইতে না পারলে চলবে কেন?

—ওহ্ সুহাস সুহাস কেন বুঝতে পারছ না ও আমার পাপ, আমি

অন্যায় করেছি, ওকে একটা পেনশন দিয়ে বিদায় করে দাও। আমাকে ক্ষমা করো।

—কী মুশকিল ওকে তো আমিই এনেছি তোমার সেবার জন্যে। পাপেরই বা কি আছে আর অন্যায়েরই বা কী আছে!

মাঝরাতের এই আলাপন শুনে আমি অস্থির হয়ে উঠি। বাবা, ঠাকুর, মহর্ষি কীই বা তাঁর পাপ থাকতে পারে? ময়না! ময়নাকে আমি কেমন এক ধরনের পছন্দ-অপছন্দ করতুম, ওর হাত থেকে অনেক কাজ কেড়ে নিয়েছি, মেয়ের অধিকার ফলাতে। কিন্তু পাপ? পাপ কেন?

গা ছমছম করছে, সারা রাত আমি ভূতের ভয়ে জেগে আছি। মা বাবা কেউ কিছু জানেনই না।

মা বললেন— খুকু কিন্তু তোমার অন্য সন্তানদের মতো নয়, সব কিছু বিনা প্রশ্নে মেনে নেবে না। সাবধানে কথা বলো।

—তা যদি বলো সুহাস, খুকু, ভুল এরা কার সন্তান? আমারই কি! মৃত্যুশয্যায় আমায় মিথ্যে বোলো না। বাবা যেন ডুকরে উঠলেন।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর কেমন উদাস অথচ কঠিন গলায় বললেন—বেশ। তবে শোনো, বোঝবার চেষ্টা করো—দুটি সন্তান তোমার নয়, আমার, কে কে তা তোমাকে বলব না, চিরদিন অন্তর্দৃষ্টির গৌরব করো, বুঝে দেখো তারা কে। তুমি দু বার আমাকে ঠকিয়েছ, আমিও ঠিক দু বার তোমাকে ...শোধ বোধ, এ নিয়ে আর কোনও কথা আমি বলব না। তুমি হাজার মিনতি সত্ত্বেও আমাকে আমার মতো থাকতে দাওনি। বারবার চেষ্টা করেছ কী করে আমাকে কুৎসিত করবে, কী করে আমাকে সামান্য সংসার ধর্মে বাঁধবে। বড্ড অত্যাচার করেছ আমার ওপরে। নইলে আজ আমি কোথায় কোন উঁচুতে উঠে যেতুম! তুমি হতে দিলে না। তবে আমি মেনে নিইনি এ তো তুমি জানোই। জন্ম আর মৃত্যু এর ওপর তো কারও হাত নেই। জন্মিলে মরিতে হবে, এ তো জানাই কথা, মহর্ষি, মরার কথা বলে আমার আদর কেড়ো না। জন্মমৃত্যুর মাঝখানের প্রকাণ্ড হাইফেনটাতে কী কী করলে, কেমন ভাবে জীবন কাটালে, সেটাই আসল। আর মৃত্যুকালে তোমার হরিনাম মনে আসছে না, কে তোমার বীর্যজাত আর কে নয় এই ভেদবুদ্ধি নিয়ে শেষের দিনগুলো কাটাচ্ছ এ-ও তো আশ্চর্য হতাশার কথা। তোমাকে যে লোকে মহর্ষি

বলে, গুরু বলে মানে কত লোকে, তাদের মুখ চেয়ে অন্তত নিজেকে সংযত করো!

বাবার ঘরে এই সব কথা হচ্ছে, নিচু গলায়, পাশে মায়ের ঘরে আমি সব শুনছি। শুনছি আর কাঁপছি। কাঁপছি আর চিত্রার্পিত, স্থাণু হয়ে যাচ্ছি। পনেরো বছর বয়স আমার, সবে তরল যৌবনের মুখ দেখেছি। জন্ম-পাকা মেয়ে আমি, কিন্তু সে গীতা-উপনিষদের ব্যাখ্যায়, বাজারের পয়সা আর ধোপার কড়ির নিখুঁত হিসেবে. গল্পের বইয়ের সংখ্যায়, আর পরীক্ষার উত্তরপত্রে. আর সব ব্যাপারে নিতান্ত ছেলেমানুষ।

ঝড়ও শুরু হল, আমার দরজার বেলও বেজে উঠল। বাবুই অনেকক্ষণ এসেছে। ও ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। কে এল? ফুটোয় চোখ রেখে দেখি একটি যুবকের আকার যেন, একমাথা চুল, ঝড়ে উড়ছে। ও হো, তাই তো, চয়নের আসবার কথা তো! তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিই, ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর, তিরের ফলার মতো বৃষ্টি, সেই সঙ্গে ভেতরে ঢুকে আসে চয়ন, তার পেছন পেছন একটি মেয়ে।

তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিই। —বোস বোস তোরা বোস। চয়নকে দেখলুম অনেক দিন পরে। কিশোর ছিল, যুবক হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েটি আশ্চর্য। সালোয়ার কামিজ পরা, ওড়নাটা মাথায় জড়িয়ে নিয়েছে, হিলহিলে চেহারা, গোধূলির মতো গায়ের রং। আশ্চর্য ঝকঝকে চোখ, সরু নাক, স্ফুরিতাধর। অসম্ভব মায়াবি একটা চিবুক। দেখবার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রেমে না পড়ে উপায় নেই। চয়ন তো ছার, আমিই পড়ে যাচ্ছি। আকর্ষণ, নিপাট, অমোঘ, মধুর এক আকর্ষণ। জৈব? হয়তো, কিন্তু মনের উপস্থিতি অন্তত পঞ্চাশ ভাগ তো বটেই।

—কে রে তুই? আমি হাসিমুখে জিগগেস করলুম।

ও আমার চোখে চোখ রেখে বলল— আমি একজন বারাঙ্গনা।

আমি আপাদমস্তক চমকে উঠেছি।

দুলেন্দ্র

দোল দোল দোলে ও দোলে মায়ের কোলে
ওর কপালে দিই টি'টা আমার উজলে ওঠে ভিটা
মায়ের কপালে সুড়সুড়ি দোলন কাটে বুড়বুড়ি
দুধ সায়রে ডিঙা বাই পেটটি করে আই ঢাই
আ মরি ঠোঁট ফুলছে দুধ তুলছো কে করেছে কী!
আমরা মায়ে পোয়ে বারদুয়ারে কপাট দিয়েছি।

ছড়াটা যখন আমায় শোনাচ্ছিলেন বাবা, তখন তাঁর মুখে যেন আলো জ্বলছিল। দু তিন বার করে বলছিলেন, কারণ ছন্দ রাখতে পারছিলেন না। শেষ করে বললেন— সুহাসের মুখেচোখে নির্ভেজাল মাতৃত্বের আনন্দ আমি ওই একবারই দেখেছি। কী ছড়া! কী পদ্য! কী আদর! সুহাস যে অমন উচ্ছ্বসিত হতে পারে আমার জানা ছিল না। বড় আনন্দ পেয়েছিলাম, বড্ড। আর জানিস ছেলেটা খালি দোলে, খালি দোলে, দুলছে বলেই দুলেন্দ্র। বড় আদর কাড়া নজর কাড়া সদানন্দ ছেলে ছিল রে!

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। দুলদা যেন মেয়ে হতে হতে ছেলে হয়ে গেছে। অত রং ছেলেদের থোড়ি মানায়! তার ওপরে অত অল্প দাড়ি গোঁফ! দুলদা গোঁফ গজানোর আপ্রাণ চেষ্টা করত। ক্ষুর টানত গালের ওপর, কদিন পরেই বলত— দেখ তো খুকু গজিয়েছে কিনা!

—না দুলদা, কেন তোমার কী সুন্দর নরম গাল, যখন আমার গালে গাল ঘষো তখন একটুও লাগে না। আর নীলদা! বাপরে, গাল ছড়ে যায় একেবারে!

নরম গালের প্রশংসা দুলদাকে মোটেই খুশি করতে পারত না। ঠোঁট উলটে ভ্যাংচাত —হ্যাঁ অ্যা, গাল ছড়ে যায় একেবারে! দুলদাকে যখন প্রথম দেখেছি, ওকে তাপসকুমারের মতো লাগত দেখতে, তারপর ক্রমশ বড়লোকের উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেদের মতো হয়ে গেল। কালো কুচকুচে চুল কাঁধ পর্যন্ত রাখত, টুকটুকে লাল ঠোঁট সিগারেট খেয়ে খেয়ে কালচে মতো, তো তারই কী শোভা! বড় বড় পাতা ছাওয়া চোখ, তীক্ষ্ণ নাসিকা, মুখটা একটু গোল গড়নের ছিল অবশ্য, মাঝারি হাইট, বেঁটে একেবারেই নয়, কিন্তু লম্বাও তাই বলে

বলা যায় না। একটু নধর গড়ন হয়ে গেল দেখতে দেখতে। দুলদার ইচ্ছে ছিল সিনেমায় নামবে। শুনেছি প্রোডিউসার না ডিরেক্টর কে জানি, পরামর্শ দেন, যাত্রায় চেষ্টা করতে। —যাত্রায় যদিও এখন মেয়েরাই মেয়ের রোল করে, তবু এত সুন্দর ছেলে দেখলে ওরা লোভ সামলাতে পারবে না, মেক আপ করে দিলে আর দেখতে হচ্ছে না। কিন্তু সিনেমায় তো অত চড়া মেক আপ চলে না! এটাই অসুবিধে।

—আর গলাটা? গলাটা ওরা কী করে মেকাপ করবে? দুলদা রেগে মেগে জিগগেস করে। সত্যিই গলাটা ওর বেশ হেঁড়ে। তখন ভদ্রলোক মুচকি হেসে বলেন— হ্যাঁ, ওটা সিনেমায় হলে ডাব করে দেওয়া যেত। হাফ সিনেমা, হাফ যাত্রা যদ্দিন না চালু হচ্ছে তদ্দিন একটু ধৈর্য ধরুন।

শুনে আমি রেগে কাঁই। মানুষের চেহারা প্রকৃতিদত্ত, তা নিয়ে যেমন বড়াই করা সাজে না, তেমন ঠাট্টা তামাশা করাও অত্যন্ত কুরুচির পরিচয়। —কেন তুই ওই সব বাজে লোকেদের কাছে যাস। আমাদের ক্লাবের থিয়েটারে দুলদার রোল ছিল বাঁধা। রাজপুত্র, ফিল্‌ম স্টার, মেয়ের ছদ্মবেশে গোয়েন্দা, দারুণ মানাত। ভালো অভিনয় করত দুলদা। কিন্তু কিছুতেই ফিল্‌ম-জগতে দাঁত ফোটাতে পারল না।

চা-বাগানের কাজ নিয়ে আসামে চলে গেল যখন ওখানে পরিস্থিতি খুব তপ্ত। সহজে পেয়ে গেল। মা বাধা দেননি। এটা দুলদার একটা প্রচণ্ড অভিমানের জায়গা। কিন্তু ও বোঝে না, মায়ের কাছে শুধু ছেলে হলে হবে না, প্রমাণ করতে হবে নিজেকে। দুলদা নিজের দায়বদ্ধতা প্রমাণ করতে পারেনি। তা হলেও মা ওকে আঁচলে বেঁধে রাখবেন, এ জিনিস সুহাসদি ছিলেন না। আসাম গিয়ে তবু ওর হিল্লে হল। ভালোই তো হল। সব ভালো যার শেষ ভালো। শুধু নাটক আর নাটক, আর আড্ডা আর আড্ডা এই তো ছিল ওর জীবন।

—দুলদা চাল নেই, পাঁচ কিলো মতো এনে দিয়ে যা না রে!

—আমি পারব না, তুই যা।

—আমি কি অত বইতে পারি!

—এক কিলো এক কিলো করে আনবি। দেখছিস না পড়ছি!

—দোলন, বাবাকে একটু উঠিয়ে বসিয়ে দাও তো।

—বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু শুইয়ে দিতে আবার ডাকবে না।

ইতিমধ্যে আমি বাজার করছি, ওষুধ কিনছি, ঘরদোর গুছিয়ে রাখছি, অত বড় বাড়ি একা ময়নার পক্ষে পরিষ্কার রাখা সম্ভব নয়, আমিও করছি। মামলা হচ্ছে দাসেদের সঙ্গে জমির সীমানা নিয়ে, আমি উকিলবাড়ি যাচ্ছি, সঙ্গে কখনও আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট টুকাই। কিন্তু লালদা কলকাতায় থাকে বউদিকে নিয়ে, নীলদা তামিলনাড়ু না কোথায় নিজের কেরিয়ার করতে ব্যস্ত, দুলদা বাড়িতে রয়েছে, কিন্তু কোনও কাজে তাকে পাওয়া যাবে না। আমার পনেরো, টুকাই দশ, দুলদার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স। কিন্তু সব করছি আমরা, ছোটরা, বিশেষত আমি। মা বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত। যে মা দু দিন পর পর বিকেলে বাড়ি থাকতেন না এই বয়সেও, তিনি বেরোচ্ছেন না বাড়ি ছেড়ে। উঠছেন না বলতে গেলে বাবার পাশ ছেড়ে। তাহলে? পাশে একটা ছেলে তো লাগে? দোলন বাড়ি রয়েছে সে করবে এটাই তো প্রত্যাশিত। কিন্তু সে করছে না। আপাতত আমি ছেলে হয়ে গেছি। আমার পড়াশোনা চুলোয় গেছে। কিন্তু আমি তো মেয়ে? আমার পড়াশোনা কি দুলদার চার্টার্ড-এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ? না কখনওই নয়। কিন্তু দোলন তো পড়াশোনাটা গুরুত্ব দিয়ে করেই না, ও দিকে খুকু যে ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল। মাধ্যমিক দেবে। ও খুকু ঠিক সামলে নেবে, ও হল গুছোনি মেয়ে।

বিকেলবেলা প্রায় রোজই তিন-চার থেকে পাঁচ-সাত জন করে আসবেই বাবাকে দেখতে। তখন চা করতে, মুড়ি মাখতে কি অন্য খাবার করতে আমার প্রাণান্ত। ময়না চিরটা কাল ছিল বাবার খাস লোক, সে এ সব করতে বেশ বিরক্ত হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাগার ঠেলা করে কাজগুলো করে। তখন বাবা বিরক্ত হন। শুয়ে শুয়েও সব দিক খেয়াল থাকে তাঁর। মা-ও পছন্দ করেন না এ রকম কাজ, কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাবা শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সেই প্রতাপ কেউ যেন মানতে চাইছে না আর।

এই সময়েই বাবা যোগেশকাকাকে ডাকালেন একদিন। যোগেশকাকা অবশ্য প্রায় রোজই একবার করে আসতেন। উনি বাবার লিগ্যাল অ্যাডভাইসার। আসতেন বন্ধু হিসেবে, সেদিন এলেন উকিল হিসেবে। স্ট্যাম্প পেপার-টেপার সব নিয়ে তৈরি। দুলদাকে ডাকা হল, আমিও উপস্থিত থাকলুম, আরও কজন— সাহেবদা, যতীশকাকাকে মনে পড়ছে।

বাবা উইল করছেন— স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি, তার বিশদ বিবরণ দিয়ে বাবা সর্বস্ব পত্নী সুহাসিনী গোস্বামীকে দিয়ে যাচ্ছেন। সুহাসিনীর মৃত্যুর পর তিনি যদি উইল না করে মারা যান, তাহলে সব বর্তাবে তারকেশ্বর অনাথ আশ্রমে, তার ট্রাস্টিও তিনি গড়ে দিয়ে যাচ্ছেন। সাহেবদা ছাড়া আমার নাম ছিল সেখানে। উইল বিধিমতো সইসাবুদ হয়ে গেলে, শব্দ করে ঘর ছেড়ে চলে গেল দুলদা, মায়ের দোলন, যাকে নাকি মা সবচেয়ে যত্ন করতেন, সবচেয়ে ভালো যদি নাও বেসে থাকেন, মোনালিসার ভালোবাসা, ঘৃণা, আস্থা অনাস্থার গোপন কথা বা রহস্যকথা কেই বা বুঝবে!

গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মহানদ গোস্বামী এবে সাগরসঙ্গমে।.
ইচ্ছাপত্র রচেছেন পত্নীর ফেভারে
পুত্রদের দাবি নাই উত্তরাধিকারে।
লালমাধবী চিৎকারেন এ কেমন বাপ
পিতা হয়ে সন্তানেরে দ্যান অভিশাপ!
নীলমাধব পত্র দ্যান সবই শুনিলাম
পিতৃ-অর্থ লজিক্যালি মাতাই তো পান!

বিশ্বেশ্বরী খুঁজে পান মহা অপরাধ
কোন আইনে উইল হতে ছেলেমেয়ে বাদ?
কেহ না ভাবেন বিলু নিজে ভাগ চায়
বিলু যাহা চায় তাহা ষোল আনা ন্যায়।
ফুলেশ্বরী ফুল্লেশ্বরী কথাটি না কন
পিতৃ-শ্রাদ্ধে এসে ফুলু খাটে প্রাণপণ।
দুলেন্দ্র হুলেন্দ্র হয়ে শুধু দিন গণে
আদ্যশ্রাদ্ধ-অন্তে যাবে ভাগ্য-অন্বেষণে।

রাজেশ্বরী দিবারাত্র পাঠে দিয়া মন
কোনক্রমে মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন।

ওরা অনেকক্ষণ চলে গেছে। জানলা দিয়ে চৈত্রের প্রথম বৃষ্টির সুগন্ধ ভিজে হাওয়া হু হু করে ঢুকছে, সর্বাঙ্গ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে মায়ের আদরে। এ তুলনাটা আমি কোথা থেকে পেলুম? অভিজ্ঞতা থেকে তো নয়! তাহলে? অপরের অভিজ্ঞতাও পাঠের মধ্য দিয়ে আমাদের চেতনায় এমন আসন গেড়ে বসে যে আপন-পর ভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। আসলে আমার এখন এমনি আদরের দরকার ছিল। জৈবিক মা না-ই হোন, প্রকৃতিও তো একরকম মা-ই। আরে! প্রকৃতিই তো আসল মা। তিনি আমার প্রয়োজন বোঝেন। এই ভাবে ভাবতে ভালো লাগছে। মেয়েটা আমাকে টানছে। যেন অন্য গ্রহ থেকে এসেছে, তবু আমার ভীষণ আপন।

বলেছিল— বারবনিতাও বলতে পারেন, কিন্তু বেশ্যা কি বলা যায়? কী এমন বেশ করেছি বলুন! ও নিজের হ্যান্ডলুমের কামিজটা অবহেলায় আমার সামনে মেলে দিল, বলল— সামান্য অর্থেও না যোগরূঢ় অর্থে তো নয়ই।

আমার চোখ চকচক করছিল কৌতুকে—তুই তো পুরো বাংলা ব্যাকরণ নামিয়ে দিলি রে!

—শুনেছিলুম আপনি বাংলা সংস্কৃত খুব ভালো জানেন, তাই একটা চান্স নিলুম। ও বলল।

—তুই নিজেও তো বেশ ভালো জানিস মনে হচ্ছে।

—পরীক্ষা নেবেন?

—পরীক্ষা তো দিয়েই ঢুকলি! এখন বল কী খাবি!

—বাড়িতে যা আছে, মুড়ি, চিঁড়ে এনিথিং, উইথ চা।

আমার বাড়িতে এ দুটো জিনিসই সব সময়ে স্টক করা থাকে। তিনটে বাটিতে শুকনো খোলায় ভাজা চিঁড়ে, মুড়ি, ডালমুট, পেঁয়াজ কুচি একটু ছোলার ছাতু দিয়ে মেখে এনে রাখলুম, বড় বড় কাঁচালংকা পুঁতে দিলুম, ফ্লাস্কে চা। আমার চায়ে সবসময়ে ফ্লেভার থাকে।

খেতে খেতে চয়ন বলল— মুড়িটা তুমি খুব ভালো মাখো ছোট মাসি।

বরাবর।

আমি হাসলুম। ও তো জানে না কী পরিস্থিতিতে কীসের মূল্যে আমি নানারকম মুড়িমাখা শিখেছি! মুড়িমাখা যে এমন কিছু একটা বস্তু তা নয়, তবুও!

জিগগেস করলুম— তোর নামধাম কিছুই তো এখনও জানি না।

চয়ন বলল— ওর নাম জারিনা। ও থিয়েটার করে। 'উটপাখি'র নাম শুনেছ তো! ওর নিকি বাইজি খুব বিখ্যাত। আসলে মা-বাবা-মাসিমেসোকে দেখতে নিয়ে গিয়েছিলুম। নিকি বাইজির অভিনয়ে ওঁরা নাড়া খেয়েছেন, কিন্তু বাইজির রোলে মেয়েটি যে আমাদের মতোই... মানে স্বাভাবিক তা বিশ্বাসই করতে পারছেন না।

জারিনা বলল— তার ওপরে আমার দুটো ডিভোর্স।

—সর্বনাশ! আমি চোখ বড় বড় করে বলি, এইটুকু বয়সে তুই দু দুটো বিয়ে, তারপর আবার দুটোই ডিভোর্স করে ফেলেছিস! তুই তো রীতিমতো এলেমদার মেয়ে রে!

জারিনা হাসল— আমাকে যতটা ছোট ভাবছেন ততটা আমি নই। আমি চয়নের থেকে বয়সে বড়, যদিও আমি পার্মানেন্টলি সতেরো আঠারোয় থেকে যাই মাইন্ডওয়াইজ। আর ডিভোর্স? ছোটমাসি ডিভোর্স তো আপনিও করেছেন, কেন মেয়েদের ডিভোর্স করতে হয়, জানেন না?

আমি কিছু বলি না। সব ডিভোর্স কি এক ক্লাসের? আমি তো একেবারেই স্বেচ্ছাচারী ছিলুম না। জীবন আমাকে ঘাড় ধরে কতকগুলো কাজ করিয়ে নিয়েছে। তাইতেই কি আমি মার্কামারা হয়ে গেছি?

—জারিন, তুই একেক সময়ে বড্ড বাজে কথা বলিস, চয়ন বলল, এক্সপ্লেইন করতে কী দোষ?

—ছোটমাসি আপনাকে আঘাত দেব বলে কথাটা বলিনি, আপনিই একমাত্র বুঝবেন বলে বলেছিলুম। জারিন একটু ইতস্তত করল, তারপর বলল, একজন বিশ্রী আলগা অসংযমী মানুষ যেমন অপমানকর, অসহ্য, একজন আটকাঠ বন্ধ করা লোকও তেমনই অসহ্য হতে পারে। ধরুন আপনি নাটক করতে পারবেন না, যদিও নাটক দেখেই সে আমাকে চেয়েছে। ধরুন তারপর আমার বাইরে বেরোনো, বারান্দায় দাঁড়ানো তা-ও বন্ধ, তারপর পাহারা বসছে, কেউ

পারে? বলুন! এখন আমার কপালেই যদি এই দুই বিপরীত ঘটে যায়, আমি কী করতে পারি?

চায়ে চুমুক দিতে থাকি তিনজনেই, একগাল করে মুড়ি।

—কী গো এটা গুঁড়ো গুঁড়ো মতো দিয়েছ? চয়ন জিগগেস করে।

—ছাতু।

—তোর তো দু বার এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে জারিন, আবার বিয়ের ফাঁদে পা দিলি কেন?

—এটা একটা প্রশ্ন হল ছোটমাসি! খুব দুঃখের সঙ্গে বলল জারিন।

চয়ন তাড়াতাড়ি বলে উঠল— আমরা বছর দুই লিভ-টুগেদার করে তবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মা-বাবাকে জানিও না যেন।

—বেশ এখন আমাকে কী করতে বলিস?

—কিছুই না। তুমি মা-বাবাকে একটু কনভিন্স করো। আমি টাকাটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই মাকে হাফ দিয়ে দেব আফট্রল মায়েরই তো হক আর মা-রা দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাই, কিন্তু আমি কি মা বাবাকে কখনও অবহেলা করেছি? কী জানো। গ্রুপ থিয়েটারে টাকা-পয়সা ভীষণ কম, আর আমি স্লেট-ফেট দিয়ে কোয়ালিফাই করে বসে আছি তো বসেই আছি। কলেজে তিন সাড়ে তিন হাজারে টেম্পোর‍্যারি, পার্ট টাইম জব। কাঁহাতক পারা যায়! শেষ কালে কটেজ-ইন্ডাস্ট্রিতে েলস-এ কাজ পেয়ে ঢুকে গেলুম। কোনওক্রমে চলে যায়।

—তুই তো মহা ভুল করেছিস চয়ন, কলেজে লেগে থাকলে, রাশি রাশি টুইশন পেতিস, ওই করে লোকে বাড়ি গাড়ি করে ফেলছে। তারপর কলেজের চাকরিটা পেয়ে গেলে সোনায় সোহাগা!

—ওহ ছোমাসি টুইশনি করলে নাটক করব কখন?

—তুইও নাটকখ্যাপা?

—তবে? নাটক করতে গিয়েই তো জারিনের সঙ্গে আলাপ!

—বেশ করেছিস, কিন্তু যা করেছিস নিজের দায়িত্বে করেছিস। এখন দিদাইয়ের টাকার জন্য এত কেন? কী জানিস লোভ ব্যাপারটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

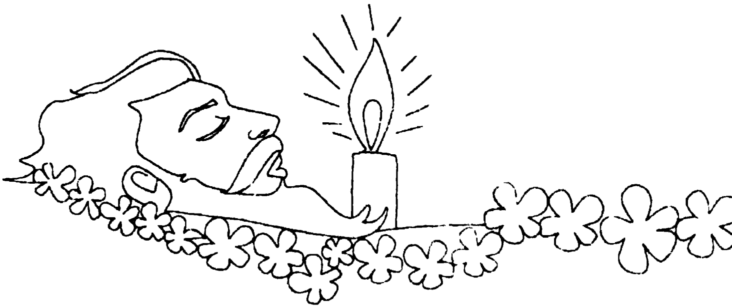
চয়ন একটু আনমনা মতো হয়ে গেল, বলল —ছোটমাসি, আর কিছু না, জীবনের এই দিনগুলো তো আর ফিরে আসবে না। এখন যদি একটা উইন্ডফলই হল, একটু ভালো খেয়ে, ভালো পরে, একটু বেড়িয়ে আনন্দ করব, এই টুকু, ভালো লাগার কাজটা করার দাম দিতে দিতে শেষ হয়ে যাব না। এর বেশি কিছু ভাবিনি। লোভ? মনে হয় আমার নেই। তবে জোর দিয়ে বলতেও পারি না, একেবারেই নেই।

জারিন এইখানে বলে উঠল, ছোটমাসি আসলে কী জানেন, চয়নটা প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে তো, কষ্ট সহ্য করতে পারে না। আমার কোনও প্রবলেম নেই, আমি রাজপ্রাসাদেও যেমন থাকব, কুঁড়েঘরেও তেমন, শুধু নিজের ভালো লাগার কাজটা করতে পারা চাই। তাহলেই মন ভালো হয়ে যায়। তাছাড়া, আমি চয়নকে আসতে বারণ করেছিলুম, কী হবে এই সম্পত্তি-টম্পত্তির গণ্ডগোলের মধ্যে থেকে? যদি কিছু পাওয়া যায়, এমনি পাওয়া যাবে, ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে দিয়ে যেতে হলে মনটা বাজে দিকে ব্যস্ত হয়ে যায়। আমি নিজে তো আসতে চাইইনি। কিন্তু আমার একটা ইচ্ছে ছিল, আপনার সঙ্গে দেখা করার লোভ আমি ছাড়তে পারিনি। বলে ও উঠে দাঁড়াল হাসিমুখে, চয়নও। খারাপ লেগেছে সে কথা বুঝতে দিচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি। আমি কিছু বলবার আগেই ওরা বেরিয়ে গেল।

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনও ঝরিছে বৃষ্টিধারা। ঝিপ ঝিপ ঝিপ ঝিপ। আমার মগজের মধ্যেও এমনি বৃষ্টিপাত ঘটছে। ঘুম, যাঃ ছিঁড়ে গেল, আবার আসছে, আবার যাচ্ছে, সমানে কতকগুলো ভাবনাপাত হচ্ছে। যাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন আমার সম্পর্ক নেই, যারা আমাকে বিপদের মধ্যে, অন্যায় অবিচারের মধ্যে একা ছেড়ে দিয়েছিল, কোনও সাহায্য করেনি, তাদের সঙ্গে যাওয়া-আসা আপনা-আপনিই কমে গেছে। এখন কতকগুলো মুখ দেখে নতুন মনে হল, লড়াই করতে করতে বহু দিন, সত্যি কথা বলতে, কোনও পুরোনো কথা মনে মনে পাকাবার সময় পাইনি। আজ হঠাৎ সেই হঠকারী, জিদ্দি, সমাজ-না-মানা খুকুকে এদের দরকার হল কেন? আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, কাগজে মাঝে মধ্যেই আমার নাম বেরোয়, কে জানে কত টাকা

করেছি, তাই কি হঠাৎ জলচল হয়ে গেলুম? ভাবতেও কেমন ঘেন্না হল। নিষ্ঠুর, সামাজিক চিন্তার ভয়ে কেঁচো এগুলো না হয় বুঝলুম। কিন্তু টাকা ও নামযশ যদি মূল্যবোধ পালটে দেয়, তা হলে মানুষ মাপবার গজকাঠিটা যে একেবারে ভুলভাল হয়ে যায়!

কিন্তু এই যে নতুন জেনারেশন, এদের মধ্যে টুকাই ছাড়া আর কাউকে আমি তো তেমন ভাবে চিনিও না। চয়নকে আরও ছোটতে দেখেছি। বাবুইটা খুব মায়াবী স্বভাবের, তাই এই সব দাদাদের সঙ্গে নিজের মনের তাগিদেই সম্পর্ক রেখে যায়, দাদাগুলোও রাখে। কিন্তু আমার ও জায়গাটা ব্ল্যাংক। তাহলে হঠাৎ বাগে পেয়ে চয়নটাকে সারমন দিলুম কেন? মুখে যেন একটা বিশ্রী স্বাদ লেগে রয়েছে। কী দরকার ছিল আমার? মেয়েটা যেন আমাকে টানছে। জারিন! জারিন! এ রকম নাম কেন ওর? যেন ছদ্মনাম! মেয়েটা আমাকে টানছে।



বাবা চলে যাচ্ছেন। বাবা চলে যাচ্ছেন। মায়ের মুখ প্রশান্ত। মা ফোঁটা ফোঁটা করে জল দিচ্ছেন মুখে। আমাকে ইশারা করছেন, আমি গিয়ে জল দিচ্ছি, বাবার মুখও কী প্রশান্ত! কথা বলতে পারছেন না, আমি মুখে জল দিতে কেমন একরকম হাসলেন, সামান্য ঘাড় নাড়লেন যেন। কিছু বলতে চেষ্টা করছেন, মুখের কাছে কান নিয়ে যাচ্ছেন মা, অখণ্ড মনোযোগে শুনছেন, আমি লিপ রিড করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। হঠাৎ বাবা স্থির হয়ে গেলেন। আর অমনি কানের কাছে ময়নার বিকট মড়া কান্না ভেঙে পড়ল। 'ওগো ঠাকুর গো আমায় কার কাছে রেখে গেলে গো?' তখন মধ্যরাত।

—শশশশশশশ মা হিসিয়ে উঠলেন, আমি রাগত গলায় বললুম— চুপ ময়না, একদম চুপ! সেই মুহূর্তে মহর্ষির জন্য শোক করতে আর কেউ নেই। দাসী, কন্যা ও পত্নী, তিনটি নারী। রোগশয্যার পাশেও তাই-ই। তবে প্রচুর ভক্তজন আসত অবশ্যই। তাদের কাজ ছিল, ভেবে দেখতে গেলে, গল্প করা আর চা খাওয়া। একমাত্র সাহেবদা ওষুধপত্র আনা, ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট নিয়ে যাওয়া এগুলো করত। অনেক সময়ে আমাকে ডেকে নিত। সময় থাকতে থাকতে তোর শিখে নেওয়া দরকার খুকু। কত কী যে আমার শেখা হয়ে যাচ্ছিল তখন, সময় থাকতে থাকতে শিখে নেওয়া দরকার বলে!

সাহেবদা ছিল ফিলসফার। অবশ্যই আমার বাবা ও মায়ের কাছাকাছি যারা

থাকবে বলে এসেছিল তাদের ফিলসফার হতেই হবে। ওঁরা সংসারের অনেক ঊর্ধ্বে বিচরণ করতেন, ওঁদের সাঙ্গোপাঙ্গরাও মাটির পৃথিবীতে বাস করতেন বলে মনে হত না। সাহেবদা আমাকে শেখাল— নারী পুরুষের দৈহিক এবং মানসিক তফাত, তার সামাজিক তাৎপর্য এবং ঔচিত্য। শেখাল মেনোপজ, অর্গ্যাজম, তাদের মনস্তাত্ত্বিক ফলাফল সকল। জানাল আমার মা সাক্ষাৎ অর্গ্যাজম, উনি মহাকালীর অংশ, আশপাশে সবাইকে চেতিয়ে তোলেন। আর বাবা সাক্ষাৎ মহেশ্বর, তিনি প্যাসিভ, কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই শক্তি পাচ্ছেন মা, আবার উলটো দিক থেকে মা-ই সক্রিয়। তিনি পুরুষের ওপরে বিপরীত বিহারে সংগম করছেন। এ সমস্তই গূঢ় তত্ত্ব। একাধারে জীবন ও সংসার, মানবজন্ম ও জগৎকারণ—এ সবের আধ্যাত্মিক মর্মার্থ যাকে বলে। মহাকালী জগদম্বা, সরস্বতী, মহালক্ষ্মী, নারায়ণ, মহাদেব, সিদ্ধিদাতা, এঁরা ভাবলোকে বিহার করছেন, সংসারে কারও কারও মধ্যে তাঁদের ছায়া পড়ে, কখনও বেশি মাত্রায়, কখনও কম মাত্রায়। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী যে শিবশক্তির বিহারে জন্মেছি। আমার ব্যক্তিগত ভাগ্য বা চরিত্রের ধরন ক্রমশ প্রকাশ পাবে। সবে তো যৌবন এসেছে।

এইসব ফিলসফি বলে সাহেবদা দূরের দিকে ভাবুকের মতো তাকিয়ে থাকত। আর আমি সাহেবদার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতুম। কী বলছে রে বাবা? একটা মেয়ে যে বড়সড় পরিবারে জন্মেছে, সে নারী পুরুষের তফাতের কথা জানবে না কেন? ঘটা করে বলবার কী আছে এ সব? আর কারও না হোক ভুলদার লিঙ্গ তো আমি কতবার দেখেছি। এমনকী ওর ইরেকশনও আমার দেখা হয়ে গেছে। তখনই ওর কোনও অসুখ করছে ভেবে আমি তো মহর্ষির কাছে ছুটে গিয়েছিলুমই। উনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বাস। আর আমার নিজের শারীরিক পরিবর্তন? সে তো নিজেই দেখছি। বন্ধুরা আছে না? এখনও তোর পিরিয়ড হয়নি? খেয়ে ফেলত না আমাকে? ফুলদিও জিগগেস করত, বলত তোর একটু লেট দেখছি। কিন্তু তার পর যে শব্দগুলো ব্যবহার করল সাহেবদা, মেনোপজ অর্গ্যাজম, এ সব আমি বাপের জন্মে শুনিনি। মেনোপজটা যদি বা বুঝলুম, অন্য শব্দটা আমার বোধের বাইরে রয়ে গেল। বাকিটুকু শাস্ত্র না ভূতুড়ে কিছু আমি ঠিক করতে পারিনি। মা বা বাবার

সঙ্গে যাদের ওঠাবসা তারা কি সব অন্য জগতের লোক? আমরা যা পড়ি বিভূতিভূষণ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সুবোধ ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু, এ সব কি ওরা পড়ে না? কী রকম যেন বিজাতীয়। বাবা থাকলে বাবার কাছে জেনে নিতুম, মায়ের কাছে আমি অতটা ফ্রি নই, বাবার অসুখের পর অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়েছি। কিন্তু এ সব কথা জিগগেস করার মতো নয়। তাই চেপে গেলুম। তা ছাড়া আমি তো এখন বুঝেই গেছি অনেক কথা আমায় নিজে নিজে বুঝতে হবে। কারও সাহায্য পাব না। আমার একটা কেমন বিভ্রান্তি হল এই জন্যে যে এই সব শরীর-টরীর নারীত্ব, ইত্যাদি ব্যাপারগুলো তো কোনও পুরুষমানুষ মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করে না। তাই আমার খারাপ লাগছিল, লজ্জা বা তার চেয়েও বেশি অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু ওই যে ভঙ্গির মধ্যে একটা শাস্ত্রকথা শাস্ত্রকথা ভাব, তাতে মনে হচ্ছিল লজ্জা করাটাও কেমন যেন লজ্জাকর। মোট কথা এই রকম একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে আমি হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করলুম তিনটে লেটার নিয়ে, বাংলা নিয়ে পার্ট ওয়ান পড়ছি তুমুল আনন্দে, হঠাৎ শুনলুম বাড়ি ভরে একটা নাকি ভীষণ খুশির খবর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার নাকি বিয়ে। সাহেবদা মায়ের কাছে প্রস্তাব রেখেছে।

শুনে আমার চক্ষু চড়কগাছ। আমি লাল টকটকে মুখে মায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত। —মা এ সব কী শুনছি?

—কী রে খুকু?

—তোমরা নাকি সাহেবদার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করছ?

—তোরাই তো ঠিক করেছিস খুকু?

—কে বলল?

—সাহেবই তো বলল, তোমার সঙ্গে ওর নাকি চমৎকার আন্ডারস্ট্যান্ডিং?

—মা, এসব বাজে কথা। মাঝে মাঝে সাহেবদার সঙ্গে এটা-ওটা কেনাকাটা করতে গেছি, হয়তো বসে কিছুক্ষণ গল্প করেছি, তাইতে অমনি তোমরা বুঝে গেলে...

—শোনো খুকু, এই মুহূর্তে সাহেব তোমার জন্যে সবচেয়ে ভালো পাত্র। তোমার চেয়ে বছর বিশের বড় ঠিকই, কিন্তু কী সুন্দর চেহারা, তোমাদের বাবার সঙ্গেও আমারও বয়সের তফাত ছিল কুড়ি বছরের।

—ও সব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। বিয়ে করতে হবে কেন

আমায়? এই মুহূর্তে মানে কী? আমি তো সবে বি.এ পড়ছি। বিয়ের কথা উঠছে কেন?

মা বললেন— সারা তারকেশ্বরে তোমাদের প্রেমের কথা ছড়িয়ে গেছে। তার মানে বোঝো?

—না। মিথ্যে কথার আবার মানে কী?

—ঠিক আছে এই কথা আমি সাহেবকে জানিয়ে দেব।

—দিও। আমি পড়াশোনা করে অনেক কিছু করব মা, তুমি অন্তত আমার পাশে থেকো। বাবা থাকলে কেউ এসব কথা তুলতেই পারত না।

মার মুখে একটা দুর্বোধ্য হাসি ভেসে উঠল, বললেন— তাই? খুকু তোমার বাবা যে নেই তাতে করে একটা মস্ত বড় তফাত হয়ে গেছে। বিষয় সম্পত্তির হালচাল, কোথায় কী আছে, এসব আমি কিছুই জানি না। সাহেব জানে। কিন্তু সে আমাকে কিছুই বোঝাচ্ছে না। সাহেব যদি অন্য কাউকে বিয়ে করে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি বুদ্ধিমতী এর চেয়ে বেশি কিছু তোমায় বলবার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। তোমার লেখাপড়ার কোনও ক্ষতি হবে না। তুমি পড়াশোনা করে আইন পড়ো এই আমি চাই। বিবাহিত জীবনেও সুখী হবে এই আমার আশা। আমার চারদিকে নেকড়েরা নিশ্বাস ফেলছে, তরোয়ালটা একমাত্র তোমারই হাতে।

মা চুপ করে গেলেন, স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, যেন ধ্যানস্থ। তখন মায়ের ষাটের কাছাকাছি বয়স। মা বসে আছেন বেলে পাথরের মূর্তির মতো, সুগঠিত, তাম্রকেশী এক রাজরক্ষিণীর মতো শক্তিশালী, ধীর, অথচ ক্ষিপ্র। তবু অসহায়।

—বাবা যে সব তোমার নামে লিখে দিলেন, তুমি কিছুই জানো না মানে কী মা?

—তোমার বাবার যা কিছু সবই জমি, জমি আর জমি, ধানজমি, ফলবাগান, পুকুর। নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে, সে সব আদায় তশিল যোগেশদা যতদিন করেছেন করেছেন, উনি বেঁচে থাকতে থাকতেই সাহেবই বকলমে সব দেখাশোনা করত। আমি এখন জানতে চাইছি সব, ও আজ নয় কাল করে করে কাটিয়ে দিচ্ছে, এ সব ব্যাপারে আমার মাথা দিতে ইচ্ছেও করে না। ছেলেরা ক্ষিপ্ত, যদি বা সাহায্য করত, এখন সবাই একেবারে মুখ ঘুরিয়ে

নিয়েছে। যোগেশদা মারা গিয়ে সাহেবেরও কেউ নেই। এখন তুমি যদি ওকে বিয়ে করো সব দিক রক্ষা হয়। তুমি সামলে নিতে পারবে, আমিও নিশ্চিন্ত হব। তোমার বাবা ইচ্ছে করে আমাকে জব্দ করতে এই দায় আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে গেলেন।

তখন আমি স্পষ্ট বুঝলুম সাহেবদা মাকে ব্ল্যাকমেল করছে। অস্পষ্টভাবে এও বুঝলুম বাবা এই ভাবে মরণের ওপার থেকে মাকে একরকম ব্ল্যাকমেলই করে যাবেন। কেন, তার উত্তর আমি জানি না, মাকে এখন জিগগেস করাও বৃথা। কিন্তু এটাই বাস্তব।

ছাতে দাঁড়িয়ে আছি। এই সিমেন্টের মেঝে, ইটের দেয়াল, তার ওপরে সিমেন্ট-চুনের পলেস্তারা—এ সবের বাস্তবের মাঝখানে নিজেকে আগন্তুক মনে হয়। কারা বুনেছে এই সাংসারিকতার জাল? কেন আমরা ছিন্ন করতে পারি না এসব? মা? মা-ও পারেন না? চান না? ভীষণ একটা ভেতরের বিতৃষ্ণায় আমি ওপরের দিকে চাই। কোনও সমাধান, কোনও সাহায্য কি ওখানে আছে? ক্রমশ সন্ধে ঘন হয়ে আসছে। আকাশে একটা দুটো করে তারা ফুটছে। দেখছি তো দেখছিই। ওই তারারা আমাকে ডাকে। একটা বিপুল পৃথিবীর দিকে ডাকে। এখনও জানি না বিজ্ঞানে ডাকে, না কাব্যে ডাকে। কোথায় ডাকো আকাশ? হে আকাশ, কোথায় ডাকো? হে তারকাপুঞ্জ, ডাকো কেন? সে ডাকের প্রকৃতি বুঝতে পারি না যে!

হঠাৎ কী রকম মনে হল আকাশটা আমার ভেতরে ঢুকে গেল, নদীতে ঘূর্ণি থাকলে যেমন আশপাশের জল দুরন্ত বেগে তার ভেতর প্রবেশ করে, তেমন। আমার ভেতরে যেন একটা চুম্বকের মতো কিছু আছে, সেটা আকাশকে টানছে, টেনে নিচ্ছে। গ্রহ তারা নীহারিকা, আলতো ভাসা মেঘরাশি সব, স-ব। এত প্রচণ্ড সেই আকাশের ভার যে আমি দুলতে থাকি, ফুলতে থাকি, হেলতে থাকি, তারপর পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে শুয়ে পড়ি, চোখ বুজে আকাশ ভাবি, অরুন্ধতী, লুব্ধক, মৃগশিরা, শতভিষা ভাবি। একেবারে শ্লথ, শক্তিহীন হয়ে যায় আমার শরীর, সে আর তো শরীর নেই, আকাশের সঙ্গে মেশামেশি হচ্ছে তার। এবং এই সময়ে কোনও অন্ধকার আকাশ-কোণ থেকে শনি হয়তো বা শনিই আমার তদগত বহিঃ শরীরকে আবৃত করল, আমাকে দলছে, পিষছে, আমার মুখ হাত পা সব অধিকার

করে নিচ্ছে শনি, আর আমি এতই মূর্ছাহত যে মুখ দিয়ে সামান্য কষ্টের শব্দ ছাড়া কিচ্ছু করতে পারছি না। উঃ শনি আমায় ছাড়ো, ছাড়ো আমি এখন আকাশ-নিদ্রায়, বলতে বলতে তীব্র যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করে উঠি, শনি তার বিশাল ভার নিয়ে আমাকে আরও জড়িয়ে ধরে, বলে খুকু খুকু রাজেশ্বরী, শেষ পর্যন্ত তোমাকে চোদন করলাম, কত ফিরিয়ে দেবে আমায়? তুমি আমার, আমার, আমার, ওহ কী আনন্দ, কী অলৌকিক আনন্দ তুই দিলি আজ আমায় খুকু। আমি তোর জন্যে, তোরই জন্যে এতদিন কুমার ছিলুম রাজেশ্বরী।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে কেউ বলে উঠল —ওমা, ই কী গো? চারদিক শুনশান পেয়ে তোমরা এখানে ই সব খেলছ? ছি ছি ছি! তারপরই আরও একটা গলা শুনলুম— সরে এসো, ওখান থেকে সরে এসো ময়না, ছিঃ, ওদের একটু সামলাতে দাও।

আকাশ, হে আমার আকাশ, একদিন যেমন নিঃশেষে ঢুকেছিলে আমার মধ্যে, তেমনি নিঃশেষে বেরিয়ে গেছ। বাতাস ভরে শেহনাই বাজছে। আমার অঙ্গে অঙ্গে বিড়ম্বনা। যেন চারদিকে সবই বিজাতীয় কিছু, এমন দুর্গন্ধ, ভেতর থেকে আকুলি ব্যাকুলি করে কী যে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে, বেনারসি আর গয়না ফুটছে শরীরে, লক্ষ্মীটি আমায় তোরা ফুলের মালা পরাস না। বাঃ এটা তো পরতেই হবে, এটা ভাইট্যাল, মালাবদলের, মালাবদল মাই ফুট, আমি মনে মনে ফুটছি। লালদা, নীলদা ঘুরে গেল, সাড়ে সাতটায় লগ্ন, তোমরা দেরি কোরো না!

—নীলদা, নীলদা!

—কী?

—একটু আয় নীলদা, এখানে আয়। এই তোরা যা না একটু যা।

—কী বলছিস?

—বিশ্বাস কর নীলদা, সব মিথ্যে।

—কী?

—এই সব প্রেম-টেম সব। বিশ্বাস কর নীলদা আমাকে রেপ, রেপ করা হয়েছিল।

স্তব্ধতা খানিকক্ষণ। তারপর নীলদা বলল —জানি। অনুমান করেছিলুম।

—জানিস? কিছু করলি না? নীলদা?

—এখন তো আর কিছু করার নেই, যখন ঘটনাটা ঘটেছিল আমি অনেক দূরে। এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। লোকটা কর্ত্রীর সঙ্গে ষড় করেছিল। কোনও না কোনও ভাবে। ঠারে-ঠোরে। তোর কি মন একদম সায় দিচ্ছে না?

—না না না।

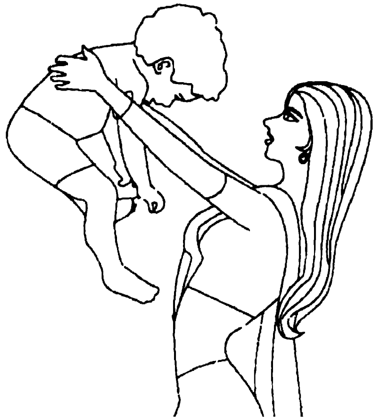
—অত চিৎকার করিসনি। ও কিন্তু যাই করুক তোকে ভালোবেসেই করেছে। সম্ভবত মরিয়া হয়ে। তুই যেটা ভালোবাসিস সেটা মন দিয়ে কর, আফটার অল কার সঙ্গে কার বিয়ে হল অথবা হল না তাতে কিছু এসে যায় না। আসল হল তোর ভেতরের চাওয়াটা, সেটাকে ফুল ভ্যালু দিতে হবে। আমাদের সকলের ভেতরে একটা নিজস্ব আকাশ আছে। সেখানে আমাদের গ্রহ-তারা। আমাদের নিজস্ব সোলার সিসটেম খুকু। সেইখানে থাকবি।

আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম একেবারে। নীলদা কি অন্তর্যামী? নীলদা কি ঈশ্বর? কী করে জানল? কী করে?

সাজগোজ শেষ করে ওরা আমাকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। গয়না, বেনারসি, ফুলভার, সব কিছুর মধ্যে দিয়ে আমি যেন এক অচেনা আমির দিকে চেয়ে আছি।

পাড়ার সোনামাসিমা, সেই যাঁর সঙ্গে মোনালিসার চেহারার খুব মিল, তিনি বলে উঠলেন— এক্কেবারে বসানো সুহাস। তারকেশ্বরে এল নারায়ণ আর পরমের সঙ্গে। এমন বিয়ের বেশে দেখিনি ঠিকই। কিন্তু একদম বসানো। আগে আমরা ভাবতুম ফুল ফুলেশ্বরী বুঝি তোরটা পাবে। এটাকে পাত্তাই দিইনি। এখন দ্যাখ, ও সুহাস। একবার দেখে যা না!

দূর, খুব দূর থেকে ভেসে এল —তোমরা দ্যাখো। আমার দ্যাখা আছে। একটু পরে আবার ভেসে এল— ও ওর মতো, আর কারও মতো নয়।



মা! ও মা! বাবুই কাছে এসে কাঁধে হাত রাখল— কখন থেকে তোমায় ডাকছি!

—কোথায়! আমি শুনতে পাইনি তো!

—ওঘর থেকে ডাকছিলুম, কেউ কি এসেছিল?

—হ্যাঁ, তোর চয়নদা তার বউকে নিয়ে এসেছিল।

—আমাকে ডাকলে না?

—তুই কী রকম ঘুমোচ্ছিলি, যেন বাড়িতে কেউ নেই-ই। তারপরেই খেয়াল করলুম ওর হাতটা যেন গরম।

—তোর তো বেশ জ্বর মনে হচ্ছে রে।

—তোমারও তাই মনে হচ্ছে? আমি কীরকম অজ্ঞানের মতো ঘুমোচ্ছিলুম, ঘোর একটা, বুঝতে পারছি কেউ, কারা কথা বলছে, কিন্তু নিজেকে কেমন তুলতে পারছিলুম না।

আমি ওর জ্বরটা দেখে প্যারাসিটামল দিলুম, ও বাইরের ঘরে আরাম-চেয়ারটায় শুল, চোখ লাল, বলল—খিদে পাচ্ছে কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না।

—দুধ সাবু খা।

আমরা মা ছেলে দুজনেই দুধ সাবু খেতে ভালোবাসি। বার্লিও একটু লেবু টিপে দারুণ লাগে আমাদের। গরম দুধ সাবু খেয়ে ও আবার ঘুমিয়ে পড়লে, আমি জয়ন্তদাকে ফোন করলুম, উনি একটা দিন দেখতে বললেন। ভাইর্যাল

হচ্ছে খুব।

রাতে আমিও দুধ সাবুই খেয়ে নিলুম সঙ্গে এক পিস পাঁউরুটি।

ওই সেই ছেলে যে এক অদ্ভুত ঘোরের রাতে আমার মধ্যে উৎপন্ন হয়েছিল। ও কার বীজ? এই প্রশ্ন আমাকে বিভ্রান্ত রেখেছে। আপাত ঘটনাস্রোতে ও সাহেবদার ছেলে। কিন্তু ওর মধ্যে একফোঁটাও সাহেবদা নেই, ও এমনকী আমার মতোও নয়। আমার কোনও দাদা দিদি, যোগেশকাকা বা তাঁর স্ত্রী এদের কারও সঙ্গে ওর কোনও মিল নেই। শুধু চেহারার সাদৃশ্যের কথা বলছি না। ও এখনও পর্যন্ত হাবে ভাবে, স্বভাবে, ওর পছন্দ অপছন্দয় একেবারে কারও সঙ্গে মিলহীন। ও আরামকেদারায় শুয়ে রয়েছে। এইটাই একমাত্র মহর্ষির জিনিস যা আমি পেয়েছি। বাবুই শ্যামল রঙের এক খুব সুকুমার চেহারার কিশোর, যার প্রতিটি অবয়ব যেন কেটে কেটে কুঁদে কুঁদে গড়া। বড্ড ছেলেমানুষ লাগে, ভীষণ স্নেহ-উৎপাদনকারী। কিন্তু এই আপাতকোমলতার মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, যেটা খুব অসমঞ্জস। কখনও ও খুব বাধ্য, নরমসরম, সাহায্যশীল, কখনও রুক্ষ, রূঢ়, অনমনীয়, কখনও আবার উদাসীন। জয়ন্তদা আমাদেব ডাক্তার বলেন—ও কিছু না, বয়ঃসন্ধিতে ছেলেমেয়েরা একটু অদ্ভুত হয়েই থাকে। কিন্তু আমি দেখেছি ও বরাবরই এমন।

বিয়ের পর ভটচায্যি বাড়িতে বদলি হয়ে গেলুম। সাহেবদাদের বাড়ি আমাদের মতো না হলেও বেশ বড়। যোগেশকাকার ও একমাত্র ছেলে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই গত। অত বড় বাড়িটায় আমরা যেন হারিয়ে যেতুম। নীচে একটা ঘর সাহেবের সেরেস্তা-ঘর। ও যখন কোর্টে বেরিয়ে যেত, সেরেস্তায় ব্যস্ত থাকত, আমার বড় সুখের সময় ছিল সেটা। আমি কলেজ যাচ্ছি, পড়ছি, আমার কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু সাহেবদা খেতে আসছে, আমার সঙ্গে কথা বলছে. রাতে শুতে আসছে, সে যেন এক মহা অস্বস্তি। আমিও ওকে সাহেবদা ছাড়া আর কিছু বলেই ডাকতে পারি না। একদিন বলল—খুকু, ব্যাপারটা কী রকম আজগুবি লাগে না?

—কী?

—তোমার ওই ডাকটা?

—কিন্তু ওটাই তো সত্যি।

একটু চুপ করা থেকে ও বলল— সম্পর্ক কি বদলায় না?

—মিথ্যের ওপর জবরদস্তির ওপর ভর করে কোনও সম্পর্ক টেকে না, বদলানো তো দূরের কথা। —মনে মনে বললুম বরং সম্পর্ক ভেঙে যায়। তোমাকে আমি বরাবর দাদার মতোই দেখে এসেছি, হয়তো একটা সময়ে দাদাদের থেকে অনেক বেশি নির্ভর ও বিশ্বাস করেছি, সেই সম্পর্কটা এমন ভাঙা ভেঙে গেছে যে আমার এখন মানসিক ভাবে যেন দাঁড়াবার একটা জায়গা নেই।

—খুকু, ও একটু পরে থেমে থেমে বলল, আমাকে একটা দিনের অসংযমের জন্যে মাফ করতে পারবে না? আমি কি তখন আমাতে ছিলাম? আমি যে কবে থেকে তোমার প্রতি আসক্ত সে ইতিহাস তো তোমায় বলিইনি।

আমি কী বলব এই জ্ঞানপাপীকে? বলব তুমি চারদিকে মিথ্যে রটনা করেছিলে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে, যার জালে আমি একটা নীল তিমি আটকা পড়ে গেছি। আমি কি বলব আমি কিছুতেই রাজি হব না বলে তুমি মতলব করে আমাকে অতর্কিতে ধর্ষণ করেছিলে, আমি একটা উনিশ বছরের সদ্য পিতৃহীন মেয়ে, যে একটা বিশাল বাড়ির যাবতীয় দায়িত্ব একলা সামলিয়ে পড়াশোনা করতে চাইছে। জ্ঞান শুধু জ্ঞানে তার প্রবল তৃষ্ণা। সব কিছু করতে রাজি আছে সে যদি তাকে জ্ঞানলাভের অধিকার দেওয়া হয়।

সে পড়বে চৈতন্যচরিত, পুরাণসকল, বৈষ্ণব পদাবলি, সমগ্র রবীন্দ্রনাথ, মহাভারত, রামায়ণ, সে পড়বে কান্ট, হেগেল, হবস, এইচ জি ওয়েলস-এর শর্ট হিসট্রি অব দা ওয়ার্ল্ড, আরও কত কত আস্তে আস্তে উন্মোচিত হবে তার কাছে, এখন তো সে মোটে বি এ ক্লাসের ছাত্রী। এই তৃষ্ণা হয়তো তার একমাত্র উত্তরাধিকার। কিংবা সব কিছুই উত্তরাধিকার দিয়ে বিচার করি কেন আমরা! এই, এটাই হয়তো তার একেবারে নিজস্ব চরিত্র, তার আত্মগুণ। এটার মধ্যে কোনও অতীতের ভার নেই। আসলে আমি ভুলতে পারি না সেই ঘরখানা, যেখানে মহর্ষি তাঁর গেরুয়া পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা পরে আরামচেয়ারে শয়ান, পাশে টেবিলে বইয়ের পাহাড়। দাগ দিয়ে দিয়ে পড়ছেন উনি। মাঝে মাঝে আমাকে পড়ে শোনাচ্ছেন রাসেলের 'হোয়াই আই অ্যাম নট আ ক্রিশ্চান' কিংবা হেরমান হেসের 'সিদ্ধার্থ' থেকে অংশবিশেষ। পড়াচ্ছেন ব্রাউনিঙের কবিতা। সেই বুড়ো আঙুল যেগুলো আমার চুষতে ইচ্ছে

করত। গাছ কোমর বেঁধে শাড়ি পরে ময়না, ভারী ভারী বই নামাচ্ছে, ছাতের ফুলে ভরা বাগান, আমি উঠছি পা টিপে টিপে, আমার কানে সংগীত ভেসে আসছে, ঈষৎ ভাঙা ভাঙা গলায়—

'আমার কী বেদনা সে কি জানো
ওগো মিতা, সুদূরের মিতা।
বর্ষণনিবিড় তিমিরে যামিনী বিজুলি-সচকিতা
সে কি জানো...'

যেন গান নয়, আকাশকে, পড়ন্ত বেলার রোদকে, ফুলগুলিকে তিনি শুধোচ্ছেন, মনের কথা বলাবলি হচ্ছে। আমিও ভাবতে থাকি— কে হতে পাবে সেই মিতা, সুদূরের মিতা, কথাগুলো না বলে চিঠিতে লিখে দেওয়া যায় না? নাকি এই আকাশই সেই মিতা? কী দুর্বোধ্য কষ্টে হৃদয় উথালপাথাল হতে থাকে। আকাশ! আকাশ! আকাশকে তো কখনওই হাতের কাছে পাওয়া যাবে না! যুক্তি তর্কের শক্ত ভিতরে ওপর দাঁড় করানো খাড়া খাড়া জ্ঞান, আর এই সুদূর বিপুল সুদূর উভয়ে মিলে কী যে এক আকুতি বুনে দিয়েছে আমার মধ্যে!

সাহেবদার মধ্যে এর একটাও নেই। আছে দুটোই এক অর্থে, কিন্তু সে ভান, ভান কেবল, আসলে লোকটা একটা ভোঁতা, প্রবৃত্তি তাড়িত অন্ধজন, যার আলো নেই, যাকে আলো দেওয়া যায় না।

পার্ট ওয়ানের পরেই বাচ্চাটা হল। বাচ্চা সামলিয়ে পার্ট টু-টা দিলুম। তার মধ্যে বোধ হয় মায়ের বিষয় সম্পত্তি বুঝে নেওয়া হয়ে গেল। একদিন মুখ কালো করে সাহেবদা বাড়ি এল, আমি তখন নিজের আনন্দে মশগুল, বাচ্চাটাকে হাউ হাউ করে আদর করছি। লক্ষই করিনি সাহেবদা দালানে চুপ করে বসে আছে।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ির রান্নার বামনি এসে বললে— দাদা তো জলখাবার কিছুই মুখে দিলেন না। শরীর খারাপ না কি, দেখো তো দিদি!

আমি বাবুইকে কোলে নিয়ে দালানে বেরিয়ে এলুম।

সাহেবদা প্রথমে মুখ তুলল না। আমি নির্লিপ্ত স্বরে বললুম— কী হল?

—পেছনে লাথ মেরে তাড়িয়ে দিল।

আমি এই জাতীয় ভাষা পছন্দ করি না। আমাদের টাউন শহরে এ সব ব্যবহার হয়ই, কিন্তু আমার মা বা বাবার সঙ্গে যারা ঘোরে তারা একটু অতিরিক্ত সাধু ভাষা বলে থাকে। বলার ভঙ্গিও খুব ভদ্র। তাই আমি অবাক হয়ে একবার তাকিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, সাহেবদা বলল— কী বললে জানো?

কে কী বৃত্তান্ত কিছুই বুঝতে পারছি না, তাকিয়ে আছি।

সাহেবদা বলল— জামাইয়ের মতো যদি আসতে পারো তো এসো নইলে এসো না।

এবার আমি বুঝতে পারি কে।

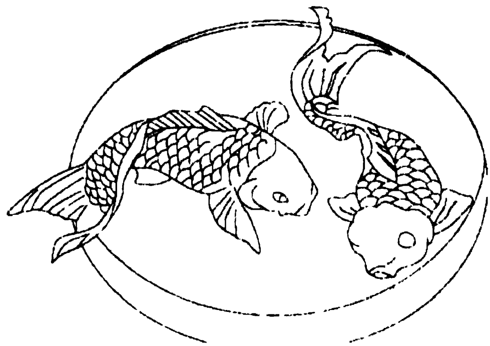
—তুমি কি জামাইয়ের মতো যাচ্ছিলে না?

—কেন? আমি তো চিরকাল বন্ধুর মতো গেছি। আজ আলাদা হতে হবে কেন?

—তুমি নিজেই তো আমাকে একদিন সম্পর্ক বদলে যাবার গল্প বলেছিলে। বলোনি?

সাহেবদা হঠাৎ আমার দিকে তেড়ে এল— ইয়ারকি হচ্ছে? ইয়ারকি?

ওর চোখগুলো লাল, কেমন অন্যরকম। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু বাচ্চাটা ককিয়ে উঠে আমার কাঁধে মুখ গুঁজল। আমি ওকে নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলুম।



সুদেবদা বড্ড তাড়া দিচ্ছেন। চার ভাগের তিন ভাগ অবশ্য আমার লেখা হয়ে গেছে। দু দিন আর কোনও কথা নয়, কাজ নয়, লেখাটা শেষ করে ফেলি। জমা দিতে গিয়ে দেখি ও মা, সেই নীলচোখ সাহেব বসে আছে। আমাকে দেখে সসম্ভ্রমে হাসল। পশ্চিমাদের এই অতিরিক্ত সম্ভ্রম দেখানোর ভঙ্গিটা আমার ভালো লাগে না, কোনও মিথ্যে জিনিস আমি দেখতে পারি না। এটা ওদের একটা সামাজিক অভ্যেস মাত্র। বলতে গেলে একটা রিচুয়্যাল। আমরা সেটাকে আন্তরিক মনে করে যদি মানুষটাকে বুঝে ফেলার প্রথম ধাপটা কষে ফেলি আমাদের অঙ্কের উত্তর কি মিলবে?

সুদেবটা বললেন— ইনি কে জানো?

আমি মুখে রহস্য-হাসি মেখে চুপ করে থাকি। উনি বলেন—নিক অ্যাডামস, ইনি কলম্বিয়ার তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক। এখানে সরেজমিনে কাজ করতে এসেছেন। আর নিক, ইনি হলেন একজন ফ্রি লানস্ জার্নালিস্ট, বাংলার সংস্কৃতির ওপর এঁর কলাম আমাদের কাগজে বেশ সাড়া ফেলেছে। ইনি রাজেশ্বরী বসুধেয়। কী হল? তোমরা কি পরস্পরকে চেনো? নিক বলল— আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে, দৈববশে, পরিচয় অজ্ঞাত ছিল।

আমি নিকের বাংলায় চমৎকৃত হই, এবং সংক্ষেপে সাক্ষাতের অকুস্থলটা বলি।

—ও, সর্বধর্মসমন্বয়ে? সুদেবটা ইনস্টিটিউট অব কালচারের এই খটোমটো ডাকনামটা তক্ষুনি বানালেন। তারপর আমার পরিচয়টা আরও বিশদ করে বলতে লাগলেন, আমি বললুম— তাহলে এই বেলা আমি রত্নাকরের সঙ্গে দেখা করে আসি। সুদেবদা অতটা খেয়াল করেন না, আমি নিককে একটা নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে ওঁর মাথায় ব্যাপারটা ঢোকে। পেছন থেকে ওঁর গলা ভেসে আসছে শুনতে পাই, যাঃ চলে গেল?

রত্নাকর আমার বন্ধু। ওর সূত্রেই আমার সুদেবদার সঙ্গে পরিচয়। আমাকে দেখে রত্নাকর বলল— জাস্ট আ মিনিট!

তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারতে লাগল ও। আঙুল চলছে কি-বোর্ডের ওপর, চট করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল— এবার কী নামালি? ফিড-ব্যাক তো ফ্যানটাস্টিক, কোত্থেকে কলমটি পেলে গুরু? আগে জানা থাকলে কোনকালে ঝেঁপে দিয়েছি।

রত্ন আমাদের ব্যাচের একজন সেরা ছেলে যাকে বলে। অধ্যাপনার নিরাপদ চাকরি ওর কোনওকালে পছন্দ ছিল না। বেশ অ্যাডভেঞ্চারপ্রবণ। এখন খবরের কাগজে এসে খুব সম্ভব পস্তাচ্ছে। পরাধীন থাকতে হলে মৌলিকতা বেচারির বড় কষ্ট। উঠে দাঁড়াল ও, বলল, চল খেয়ে আসি। কোথায় যাবি বল।

—ক্যানটিন।

—ওহ গড, এই মালটা নিজেও চিপ্পু, অন্যকেও হাত খুলতে দেবে না।

—তোকে ফিরতে হবে না?

উত্তর হল— রট্‌না নেভার লুকস ব্যাক।

বোঝো! এই থেকে অবশ্য কেউ যদি সিদ্ধান্তে আসে এ ছেলেটা একেবারে ফাঁকিবাজ সে কিন্তু তার জীবনের একটি মহা দুঃখজনক ভুল করবে। রত্ন ভীষণ সিরিয়াস। কাউকে সেটা বুঝতে দিতেই ওর আপত্তি।

ইউনিভার্সিটির দিনগুলোতে রত্নকে দেখো সারাক্ষণ আড্ডা আর আড্ডা। রেজাল্ট দেখে সবার চক্ষু চড়কগাছ।

বলি— পুরানো মস্তানিটা এখনও চালিয়ে যাচ্ছিস?

—হেভি কাজে দিচ্ছে, স্টিলল, ও হাসতে লাগল। যদি একবার বুঝে যায় তুমি কাজ করতে এয়েচো, য়ু মিন টু ওয়র্ক, হেভি খচে যায় মালগুলো।

—এখানে তোর কদ্দিন হল? এখনও বন্ধুবান্ধব হয়নি?

—বন্ধুবান্ধব? কী মাল সেটা? খায় না মাথায় মাখে? দ্যাখ রাজু, টাইম থাকতে থাকতে তোকে কতকগুলো টিপস দিয়ে দিই। তুই মনে হয় এখনও সেই পুরানো রোম্যান্টিক ভ্যানভ্যানানিতে আছিস। লুকিং ফর ফ্রেন্ডস। তুমি কিচ্ছুটি জানো না, ভ্যাবলার মতো পথ চলছ, ঝোপ ঝাড়ের পেছন থেকে ডিজনি সাহেবের মিকি মাউস বেরিয়ে আসছে, সব সার বেঁধে বেঁধে তোমার আশপাশে ডাইনে বাঁয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। গার্ড করে করে নিয়ে যাচ্ছে। ফ্রেন্ডস! জেনে রাখো বস এ দুনিয়ায় কেউ কারও নয়, সব মাল দু-নম্বরি। যত তাড়াতাড়ি বুঝবি তত তাড়াতাড়ি নির্বাণ লাভ হবে।

আমরা রেস্তোরাঁয় বেশ গুছিয়ে বসেছি, অর্ডার চলে গেছে আমি বললুম—তো আমাকে ফালতু খাওয়াচ্ছিস কেন? দু-নম্বরি তো!

—তুমি বস একটি রামছাগল, দু-নম্বরির ভিকটিম। জন্মে থেকে মুরগি হয়ে যাচ্ছ। আমি জানি না ভেবেচ? রত্ন আমার থুতনিটা একটু নেড়ে দিল, বলল, তোমাকে একটু ক্ষ্যামাঘেন্না করে ছাড় দিয়ে রেখেচি। এখন প্রবলেমটা কী বলে ফেলো তো!

—প্রবলেম আবার কী? আমি আশ্চর্য হয়ে বলি।

—মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে ইয়ার, হেভি ধন্দে পড়ে গেছ!

—ধুর, আমি উড়িয়ে দিই, প্রবলেম আবার কার কম? উই হ্যাভ টু টেক ইট ইন আওয়ার স্ট্রাইড।

আমার দিকে বেশ স্থির চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল রত্ন। তারপর বলল— ভালো, বলতে না চাস বলবি না। কিন্তু রত্ন হ্যাজ। রত্ন আছে। মরে এখনও যায়নি শালা। কথাটা মনে রাখিস।

আমি হাসি। রত্ন যে খুব বেশি রকম আছে আমার চেয়ে ভালো তা আর কে জানে? রত্ন আমার হোম সারভিসের প্রথম খদ্দের, প্রথম পি আর ও-ও বটে। রাজনৈতিক খুন খারাপির জেলাভিত্তিক ইনভেসটিগেটিভ জার্নালিজম-এর পাঠ নিই ওর কাছেই প্রথম। ও আমাকে তখন প্রবল খাটিয়েছে। যেহেতু হুগলি, বর্ধমান জেলার অনেকখানি আমার জন্মসূত্রে ঘোরা ছিল, ওর কাছে সামান্য কিছু স্থানীয় ঘটনা আর সংস্কারের কথা বলেছিলুম, তার থেকেই আইডিয়াটা ওর মাথায় আসে। সেই আমার কলাম লেখার

হাতেখড়ি। চট করে কোনও জিনিস আমি ভুলি না। সেই সব সূত্রকে ও কাজে লাগাল। সেই সূত্রেই সুদেবদা এবং ক্রমশ আরও আরও গুরুত্ব, আরও মৌলিক ভাবনা-চিন্তা। গ্রাম-নাম নিয়ে আমার প্রথম নিবন্ধগুলো এত পাঠকপ্রিয় হয়েছিল যে সবাই ভাবতে শুরু করে গল্প-উপন্যাসের দিন গেছে। এবার রম্য লেখারই যুগ এসে গেল। বাঁদরা যে আদপেই বাঁদর-প্রাচুর্যের কথা স্মরণ করাচ্ছে না, নামটা বন্দর থেকে এসেছে, অজয় নদী একসময়ে রীতিমতো নাব্য ছিল এবং অজয়-দামোদর দিয়ে বাণিজ্য হত, সেই স্বর্ণযুগের ছবি থেকে গেছে বাঁদুরে নামে, চক্ষণজাদি গ্রামটি কোনও ধনী মুসলিম ব্যক্তি তাঁর কন্যাকে দান করেছিলেন, আসলে তা চক খানজাদি, রায়না এসেছে আরবি রানা থেকে, মানে নিরুদ্বেগ স্থান। আস্থাই মোটেই গানের প্রথম চরণ বোঝাচ্ছে না, অশ্বত্থ থেকে এসেছে, এই সব নিয়ে বেশ একটা আড্ডা-আড্ডা মেজাজের রচনা হয়েছিল সেগুলো। একই সঙ্গে ব্যাকরণ, ইতিহাস, ইনফরমেশন এবং লোকজীবন। আইডিয়াটা আমার হতে পারে, কিন্তু আইডিয়ার পেছনেও যে আইডিয়া থাকে, সেটা কখনও রত্নর, কখনও সুদেবদার। কাজেই বন্ধু জিনিসটা যতই দুর্লভ হোক, রত্ন অনেকদিন থেকেই আমার প্রতি তার বন্ধুবৎসলতার প্রমাণ দিয়ে আসছে। রত্নকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু নির্ভর করতে চাই না, কিছু হলেই ছুটব— রত্ন! রত্ন! আমি আর পারছি না, এই হয়েছে, ওই হয়েছে। নাঃ, এ জিনিস শেষ পর্যন্ত নিজের ক্ষতি করে। তুমি, তুমি নিজে ছাড়া তোমার জন্যে সত্যিই আর কেউ নেই, জীবন গোড়া থেকে এ কথা আমাকে শেখাবার জন্যে এত প্রাণান্ত চেষ্টা করল কেন? বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই বহি প্রাণপণে। নিশ্চয় কোনও মানে আছে।

রত্ন বলল— তোর সেই সাহেব আর কোনও গোল করেনি তো?

আমি একেবারে অন্যমনস্ক ছিলুম বললুম— কোন সাহেব? নিক অ্যাডামস?

—ও তুই নিককেও চিনিস?

আমি চৈতন্যে ফিরে আসি। —হ্যাঁ, মানে সে রকম কিছু চেনা নয়। গোলপার্ক লাইব্রেরিতে কাজ করতে গিয়েছিলুম, জাস্ট আলাপ হয়ে গেল, আজ সুদেবদার কাছে এসে দেখি বসে আছে। সুদেবদা পরিচয়টা দিলেন। তুই চিনিস নাকি?

—চিনি মানে? কে ওকে সুদেব মিত্তিরের কাছে পাঠাল? নিউ ইয়র্কে দু বছর আগে গিয়েছিলুম না? সেই সময়ে খুব দোস্তি হয়েছিল। ওদের পেপার ম্যানিয়া জানিস তো?

—সেটা আবার কী?

—ওই অনবরত পেপার বার করে যাও, পাবলিশ অর পেরিশ। নিকটা বাংলা নিয়ে কাজ করতে চাইছিল, আসতে চাইছিল। তো এসে গেল। আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিলই। সুদেবদার দপ্তরে পাঠিয়ে দিলুম। আমার মনে হয় সুদেবদা ওকে তোর দিকেই ঠেলবে।

—কেন?

—পড়াশোনাটা করেছিস বলে, আর কেন?

—আমার অনেক কাজ আছে রত্ন, সুদেবদাকে ঠেকা। আমি একদম সময় দিতে পারব না।

রত্ন বলল— সেটা তুই নিজে করলেই ভালো হয় না?

—এই যে বলছিলি তুই আছিস!

—এ রকম একটা ফালতু কাজের জন্যে শেষে তুই আমায় অ্যাপয়েন্ট করবি? বীরপুরুষ বি কূটপুরুষের কাজ দাও গুরু, জান লড়িয়ে দেব। কিন্তু...

—সুদেবদাকে আমি হ্যান্ডল করতে পারি না রত্ন। ওঁর মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে আমাকে একটার পর একটা ব্রেক দেবেন। সেটা... রত্ন চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল— তা তুই ব্রেক চাস না?

আমি খুব অপ্রস্তুত হয়ে যাই। সত্যিই তো! রত্ন আর সুদেবদা মিলে আমার জন্যে যা করেছেন তা না করলে আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি?

—তুই বুঝছিস না, ব্রেক তো ভালো। কিন্তু সেটা আমার সুবিধে মতো না হলে বড় মুশকিল রত্ন, বোঝবার চেষ্টা কর। আমার ছেলেটার শিগগিরি মাধ্যমিক, ওর জীবনের প্রথম পরীক্ষা।

চোখ ছোট ছোট করে রত্ন বলল— ও, আমাদের সেলিব্রেটেড রাজেশ্বরীজিও তাহলে সেই সনাতন মাতৃপথ ধরে হাঁটছেন? পড়া ধরা, নোটস তৈরি করা, টিউটরের কাছে পাঠানো, ডাব-ফাব নিয়ে পরীক্ষার হলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা...

আমি স্মিত মুখে চুপ করে থাকি। কিছু বলবার নেই। সত্যিই কিছু বলবার

নেই আমার।

ও বলল— তোর মাধ্যমিকে কে দেখেছিল? আমার মাধ্যমিকেই বা কে দেখেছিল?

আমি বলি— তুই হোস্টেলে ছিলি, তোর মহারাজরা অবশ্যই দেখেছিলেন। আর আমার কথা একেবারে আলাদা। আমার মতো প্রতিকূল পরিবেশ একমাত্র মেয়েদেরই হওয়া সম্ভব। ও তো আমি নয়, আমার মায়ের মতো মা-ও ওর নয়। সিচুয়েশন আলাদা। নিজেকে যথা সম্ভব ফ্লেকসিবল রাখা ভালো। কোনও জেনারালাইজেশনই ঠিক না।

রত্ন কিছু বলল না।

ফেরবার সময়ে হঠাৎ মনে হল ও যে সাহেবটার উল্লেখ করেছিল সেটা নিক নয়। ও আমার প্রাক্তন স্বামী সাহেবদার কথা বলছিল। বাবুই শেষ পর্যন্ত কার কাছে থাকবে সে ফয়সালা তো এখনও হয়নি। উচ্চমাধ্যমিকের পরে উঠবে। কিন্তু বাবুইকে উপলক্ষ করে সাহেবদা আমাকে যখন তখন বিরক্ত করেই চলেছে, করেই চলেছে। এ দিকে বাবুইয়ের সত্যি কথা জানবার বয়স এখনও হয়নি। সাহেবদা এসে ওকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যায়, মিউজিয়ামে নিয়ে যায়, এটা সেটা কিনে দেয়, এগুলো আমি পছন্দ করি না। আমার লাইফ স্টাইল একেবারে অন্যরকম। আমি ওকে যা শেখাতে চাইছি, ওর বাবা ঠিক বিপরীতটা ওর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। আমার বলার কিছু নেই, কেননা আদালত বাবাকে এ অধিকার দিয়েছে। এখন বাবুইয়ের একটা খুব সংকটজনক বয়স। ও যদি লুব্ধ হয় বিলাসী জীবনের প্রতি, আমার করবার কিছু নেই। জানি না, সত্যিই জানি না শেষ পর্যন্ত কী হবে! আশ্চর্য, এই ধর্ষণজাত সন্তানের ওপর আমার কোনও মমতা ছিল না। যেই হাসতে শিখল, ঠোঁট ফোলাতে শিখল, ছোট্ট ছোট্ট হাত পা ছুড়তে লাগল, নির্ভর করতে লাগল আমার ওপর, কী রকম একটা গভীর মায়া, দায়িত্ববোধ আমায় ভর করল। আস্তে আস্তে আমি বুঝতে পারলুম— শিশু শিশুই, তার আর অন্য কোনও পরিচয় নেই, হয়তো সে মাটির তাল নয়, যে যেমন খুশি তাকে গড়তে পারবে না, খানিকটা জেনেটিক ফ্যাকটর তো থাকবেই, কিন্তু একটা বাচ্চাকে পরিবেশ এবং নিজের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তো খানিকটা গড়াই যায়। সেই গড়াটা আমি গড়ে দিতে চাই, তার পর কী সেটা ভাবাটা খুব বোকামি হয়ে যাবে।

আমি হঠাৎ একটু ভাবিত গলায় বলে ফেললুম— হ্যাঁ, সাহেবটা আমাকে জ্বালাচ্ছে।

রত্ন বলল— কোন সাহেব, পুরানো না নতুন?

বড্ড বিরক্ত লাগে, সব সময়ে কি ইয়ারকি ভালো লাগে?

—কীরে? রাগ করলি? বুঝেছি, পুরোনোটা। তা কী ব্যাপার বল!

—বলবার কিছু নেই। জ্বালাচ্ছে, ব্যাস।

—সুপারি দিবি নাকি?

—সুপারি? আমি চমকে উঠি, তারপর বলি— কোনও সমস্যার সমাধানই সুপারি দিয়ে হয় না রত্ন, এটা তোরা যত দিন না বুঝছিস, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত কোনও সমস্যারই কোনও কিনারা হবে না। সুপারি মাত্র একজনেরই হাতে, ঈশ্বরই বলিস আর প্রকৃতিই বলিস।

রত্ন একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল— তোর ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না রাজ, কখনও পুরুষকার চূড়ান্ত, কখনও আবার অদৃষ্টবাদী।

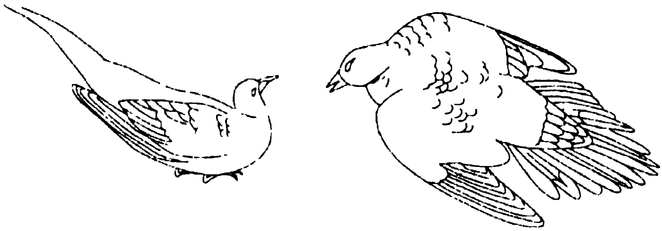
—একটু ভেবে দ্যাখ, আমরা সবাই তাই, স্বীকার করি বা না করি। তবে বাদ কথাটা বাদ দিয়ে দে।

—কেন বাদ দেব কেন? আমি বরাবর ভেবে এসেছি দেয়ার শুড বি আ মেথড ইন দা ম্যাডনেস অব আওয়ার সর্টস অব পিপল।

—তোর আছে?

—শিওর।

—তুই মনে করছিস আছে। নিজের জীবনে যদি কখনও ঝড় আসে, দিগ্‌ভ্রান্ত হবার অবস্থা তখন বুঝবি কোনও বাদ কাজ করছে না। সবটাই ইনস্টিংট, কখনও ইমপালস।



সাহেব ভট্টাচার্যকে আমার মা সুহাসিনী গোস্বামী পরিকল্পনামতো ব্যবহার করেছিলেন, কারণ তাঁর জীবনে সেই মুহূর্তে কোনও ঝড় ছিল না। কিন্তু আমি তো ঝড়ের মুখে পড়ে গেলাম। কীই বা আমার বয়স তখন, আর কীই বা আমার অভিজ্ঞতা! যদি আজকের আমি হতাম, তাহলে সেই মুহূর্তে থানায় চলে যেতুম, নথিবদ্ধ করাতুম আমার নালিশ। দেখে নিতুম সাহেব আর অন্য সব ষড়যন্ত্রকারীদের। তা না করে ওই সাহেবের গলায় মালা দিয়ে তার সঙ্গে ঘর করলুম। সে কি আমার পায়ের তলায় মাটি ছিল না বলে? আমার ইনস্টিংট আমাকে দিয়ে এম এ পাশ করিয়ে নিয়েছিল। তবে কি আমি সুবিধাবাদী? নিজে নিজেকে বোঝাই —যে ষড়যন্ত্রের শিকার তার সুবিধাবাদী হবার, প্রত্যাঘাত করার হক আছে। তাহলে সুহাসিনীর সঙ্গে রাজেশ্বরীর তফাত কোথায়?

দিনের পর দিন সাহেবদা আদালতে যাচ্ছে না, জুনিয়রের ওপর সমস্ত ভার দিয়ে বসে আছে। তাতে আমার কষ্ট হচ্ছে এমন কথা বলতে পারি না, কিন্তু অসুবিধে তো হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তাই একদিন গোঁসাই বাড়ি যাই। ভালো খবর শুনি, দুলদা নাকি বিয়ে করছে। অসমে, ওখানে চা বাগানে ভালো কাজ পেয়েছে। ফুলদি এসেছে। খুব হইচই হচ্ছে, মা-ও দেখি কী রান্না হবে, কতটা

হবে এ সব নিয়ে বেশ মেতে আছে। ফুলদি আমাকে দেখে বলল-- এই যে রাজরাজেশ্বরী, তোমাকে তো দেখতেই পাওয়া যায় না। সব সময়েই নাকি পড়ছ। গোল্ড মেডেলটা না নিয়ে ছাড়বে না।

—আমাকে তো কেউ ডাকেইনি, আমি মায়ের দিকে চেয়ে বললুম। দুলদার বিয়ে সে কথাও আমাকে কেউ বলেনি।

ফুলদি বলল— বাপের বাড়িতে বুঝি ডাকতে হয়? দোলনের বিয়ের কথা আমিও তো এই শুনলুম। এখানে তো আর হচ্ছে না যে সবাই জড়ো হবে, মজা হবে, দোলনটা যে কী করল!

মাকে আর একা পাই না, পাই না। শেষকালে সোজাসুজি ডাকলুম— মা, তোমার সঙ্গে একটা দরকারি কথা আছে, একটু শুনবে? আমি মাকে ডেকে একেবারে বাবার ঘরে চলে গেলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মায়ের সাড়া পাই— কোথায় গেল মেয়েটা?

—আমি এখানে। আমি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

মা ভেতরে ঢুকতে বলি— কী ব্যাপার বলো তো মা! সাহেবদা ওরকম করছে কেন?

—কী রকম?

—বলছে তুমি নাকি ওকে আর পাত্তা দিচ্ছ না, মনমরা হয়ে আছে, কোর্টে যাচ্ছে না।

—তুই কি চাস যে আমি সাহেবকে পাত্তা দিই?

—মানে?

—না, ও তো এখন তোর বর!

—তাতে কী? তুমিও তো ওর শাশুড়ি?

—হ্যাঁ, সেই কথাটাই ওকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম, তাতেই ফোঁস ফোঁস করতে করতে চলে গেল।

—কী করেছে ও যে ওকে কথাটা স্মরণ করাতে হল?

—এখনও সুহাসদি সুহাসদি করে আদিখ্যেতা করাটা কি ঠিক?

—মা, এতদিন তোমার এ কথাটা মনে ছিল না?

—খুকু, তোমার সঙ্গে আমি তক্কো করতে পারব না। যা তোমার পক্ষে ভালো তাই করেছি। কিছুই করিনি আসলে। কিন্তু সম্পর্কটা যে বদলে গেছে

সেটা মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার বলে মনে করি।

—তোমার বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নেওয়া হয়ে গেছে?

—তা একরকম গেছে। কিন্তু এখনও অনেক প্ল্যান অনেক গোছগাছ দরকার।

—সেগুলো বোধহয় সাহেব ভট্টাচার্য ছাড়াই হতে পারবে।

মা কেমন একটা দুর্বোধ্য হাসি হাসল, বলল— যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। খুকু খেয়ে নে, নিয়ে বাড়ি যা, তুই যে কোনওদিন উকিলের উকিল হয়ে সওয়াল করতে আসবি তা আমি ভাবিনি। ভালো, ভাবসাব হয়ে গেলেই ভালো।

আমি খেলুম না, কারও সঙ্গে দেখা করলুম না, নিঃশব্দে বাড়ি চলে এলুম। শুনশান বাড়ি। বাবুই এখন তিন বছরের। বেশ কথা বলতে পারে, হাঁটে খুরখুর করে, আমাকে দেখে বামনিদির কোল থেকে ঝাঁপিয়ে আমার কোলে এল, একগাল হাসি। বামনিদি বলল— বাব্বাঃ তোমার এ ছেলে মা ছাড়া আর কারও পোষ মানবে না। আমাকে কি কম ছোটান ছুটিয়েছে? ন্যাও এখন। অতঃপর শুরু হল ওঁর খেলা। ঝাঁঝর-বাজানো পুতুল বেরোল, ঘাড়নাড়া বুড়ো বেরোল, রকমারি গাড়ি বেরোল, তারা লাল টুকটুকে মেঝের ওপর দিয়ে সড়সড় গড়গড় করে চলে যায় আর অ্যাকসিডেন্ট করতে থাকে। যেই না ধাক্কাধাক্কি অমনি বাবুইয়ের খলখল হাসি। যত লড়াই তত মজা। অবশেষে একসময়ে তিনি আকাশ পাতাল জোড়া একটি হাই তুললেন, তারপর গুড়গুড় করে আমার কোলে উঠে এসে একটা হাম খেলেন, তার মানে ওঁর আপাতত খেলা সাঙ্গ, ওঁর প্রভূত ঘুম পেয়েছে।

কোনওক্রমে খাওয়ানো শেষ করি, ভাত থু থু করে ফেলে দেয়, এক বোতল দুধ দিয়ে অতএব খাওয়ানো সাঙ্গ করি।

ওকে খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, পড়ার ঘরে এসে এ বই ও বই উলটোচ্ছি, পালটাচ্ছি, কিছুতেই মন বসছে না। ভেতরে কীরকম একটা অসোয়াস্তি। নানা প্রশ্ন অস্পষ্ট অবয়বহীন ভেতরের শূন্যতার মধ্যে আকার নেওয়ার চেষ্টা করছে, লয় পাচ্ছে। কেমন একটা ক্রোধ, অশান্তি— সবই অনির্দিষ্ট। হৃদয়কে বলি—

কী তোমার জিজ্ঞাস্য? মগজকে বলি— তুমিই বা এমন অচল হয়ে রইলে কেন? এমন বিভ্রান্ত?

এইভাবেই কখন ঘুম এসে গেছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছি একটা অন্ধকার রাস্তা দিয়ে চলেছি। ভয় করছে না, কেননা জানি এই রাস্তার শেষে একটা আলোকিত জায়গা আছে, হয়তো একটা পার্ক, কি মাঠ, কিন্তু যা-ই হোক সেখানে প্রচুর আলো। আমি যেন কেমন করে জানি এটা স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্নকে কখনও আমি তুচ্ছ করি না, মিথ্যেও ভাবি না। কেননা স্বপ্নই সেই চাবিকাঠি যা দিয়ে আমি নিজের ভেতরের অজানা অজ্ঞাতর ঢাকনা খুলতে পারব। যে প্রশ্নগুলোর স্বরূপ দেখতে পাই না, সেগুলো সব ফুটে উঠবে এবার, উঠবে তাদের সমস্ত উত্তর সমেত। হয়তো খুব সহজ হবে না তাদের সংকেত ভাঙা, তবু কিছু না কিছু বোধগম্যতায় তো পৌঁছবই! আমি একটা গাছের পাতাভরা ডালের মতো যে দিকে আলো আছে সেই দিকের গলি খুঁজে খুঁজে চলেছি, আঁধারটা তরল হয়ে আসছে মনে হচ্ছে। হঠাৎ সামনে ঘোর অন্ধকারের একটা চাঙড়, সলিড, আমি ভয় পাই না কারণ জানি সেটা আমাকে পার হতে হবে, ওটাই আমার চ্যালেঞ্জ, তবেই আলো, তবেই মুক্তি। তাই আমি অকুতোভয়ে অন্ধকার ভেঙে ফেলবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিই, আর একটা শক খেয়ে শুনতে পাই অন্ধকারটা বিশ্রী বীভৎস গোঙানো গুঙিয়ে গুঙিয়ে বলছে— সুহাসদি, সুহাসিনী আমার ডাকিনী যোগিনী, আমার ভৈরবী এই তোকে কবজা করেছি, কেমন? আর পারবি আমাকে এড়িয়ে যেতে ছেনালেশ্বরী? তারপর একগুচ্ছ চূড়ান্ত অশ্লীল শব্দমালা, তাদের সবগুলোর আমি মানে জানি না, শুধু বুঝি, শব্দক্ষেপেই বুঝি তারা অসহ্য অশ্লীল। তারপর আমার ঘোরগ্রস্ত, প্রায় অচেতন শরীরটা আঘাতে আঘাতে ভেঙে যেতে থাকে। অন্ধকার শক্ত হাত পা দিয়ে আমায় হিঁচড়ে মাটিতে নামিয়ে আনে যেখানে এক নারকীয় বিষ্ঠাক্ষেত্র। আমাকে উন্মাদের মতো ছেঁড়ে খোঁড়ে, ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে দশদিকে নিক্ষেপ করতে থাকে। প্রত্যেকটি নিক্ষেপের সময়ে গরম সিসে ঢেলে দেয় কানে, লৌহ মুষলের মতো আমার মধ্যে প্রবেশ করে, ভেতরে উলটোয় পালটায়, আমি আর্ত চিৎকার করি, আমার গলা চেপে ধরে অন্ধকার, তারপর এক অপকৃষ্ট শীৎকারে হঠাৎ শিথিল হয়ে নেতিয়ে পড়ে। আর আমি পালাতে থাকি, পালাতে থাকি, পিছলে, সামনে ঝাঁপ খেয়ে, কিলবিল করতে করতে,

কেননা আমার হাত নেই পা নেই, ধড় নেই, মুণ্ড নেই। কী ভাবে পাশের ঘরে এসে মেঝের ওপর নিজেকে ফেলতে পারি, তার আগে দরজায় ছিটকিনি আর খিল লাগাতে পারি, তা আমি জানি না। আমার গায়ে একটা সুতোও নেই।

খুব সম্ভব মূর্ছায় ছিলুম, প্রায় সারারাত। কিংবা হতে পারে তা এক ধরনের ঘুম। যখন জ্ঞান হল, দেখলুম সিসের মতো ভোর, আকাশে বিশ্রী মেঘ, শিরশিরে হাওয়া বইছে। কী ঋতু এটা? বসন্ত না বর্ষা বোঝা যাচ্ছে না। আমি আলনা থেকে একটা শাড়ি নিয়ে কোনওক্রমে গায়ে জড়াই, পা টিপে টিপে ঘরের দরজা খুলি, বাবুইকে তুলে নিই, আমার কাঁধে মাথা রেখে সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যাচ্ছে। সিসেময় রাস্তাঘাট, সিসেময় পার্থিব জগৎ পেরিয়ে আমি গোঁসাইবাড়ির দরজায় ঘা দিই। আমার চক্ষে আগুন, আমার বক্ষে শূন্য, আমি ঘা দিই আর ঘা দিই। যখন আর পারছি না দাঁড়িয়ে থাকতে, খসে পড়ছি তখন দরজা খুলে গেল, একটা পুরুষকণ্ঠ— এ কী? এ কী? তারপর দুটো সবল হাত আমায় সাপটে তুলে নেয়, আমি ত্বরিতে বাহিত হয়ে যাই, একটা ঘরে, হয়তো সেটা সেই স্বপ্নদৃষ্ট আলোকিত জায়গা নয়, তবু তার মধ্যে কোথাও ভরসা আছে। ময়না! ময়না! আমার কর্ণপটহ বিদীর্ণ করে ডাক ওঠে। নীলদা! নীলদা! আমায় আলোয় নিয়ে যাবি? আমি আর এই তমঃ সইতে পারছি না।... আমার গলা দিয়ে কোনও স্বর ফুটছে না, কিন্তু আমি স্বজ্ঞানে আছি। প্রচুর কোলাহল! প্রাকৃত গলায় কে চেঁচিয়ে উঠল— এ কী সব্বোনাশ গো? মেয়েটাকে যে একেবারে খুন করে ফেলেছে গো? চুপ, চুপ ময়না, কতবার বলব চুপ, ফুল, মা কোথায়? এ সময়ে তো ওপরে পুজো করে, পুজো মাই ফুট, ডাক, শিগগির ডাক, নিজের কীর্তি দেখুক স্বচক্ষে। কী হবে? নীলদা! শোন ময়না যা, মাকে ডেকে আন, ফুল, তুই ইন দা মিন টাইম, ওকে একটু ওষুধ-বিষুধ দে, ওষুধ আমি দিচ্ছি, জামাকাপড় পরাসনি খবরদার! কেন নীলদা, এই যে তুলো, র ডেটল দিস না, কিস্যুই কি জানিস না? না না আগে তিনি নামুন, আই ওয়ন্ট হার টু সি ফর হারসেলফ। ওটা কি একটা পাত্র হল? জোর করবে ওর সঙ্গে, হ্যাঁ, ইসস, থেঁতলে গেছে একেবারে, তুলোটা চেপে ধর। ঘসিসনি, উঃ উঃ ফু—ল একটা, বলছি থুপে থুপে দে। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি। তুই তোর ফার্স্ট এইডটা কমপ্লিট কর, এ কী! বাচ্চাটা

কোথায় গেল, কোথায় যেন কাঁদছে? ওকে বোধ হয় ময়না নিয়ে গেছে ওর সঙ্গে, বাচ্চার কান্না ক্রমাগত কাছিয়ে আসে, কী হয়েছে? নীল, ফুল, কী ব্যাপার? ময়না যা বলছে তা সত্যি? আমি ডাক্তার পাঠিয়ে থানায় যাচ্ছি, থানায় কেন? এর পরও থানা নয়? মাথা ঠান্ডা করে কাজ করো। এ তোমার বোনের ঘরের সওয়াল। নীরবতা। কান্না পিছিয়ে যাচ্ছে। ফুল, তুই যা, আমাকে ওর সঙ্গে একটু একা থাকতে দে। ওর কথা বলবার শক্তি নেই মা। ওকে এখনকার মতো রেহাই দাও। তোরা বুঝবি না, যা না, যা! তোমার কী বলবার আছে আমার সামনে বলতে কী অসুবিধে? আমিও তো ওর দিদি, তোমার মেয়ে, আমি তো কিছু পাঁচ কান করতে যাচ্ছি না! নীলদা আমাকে বলেছে এক মুহূর্তও ওর কাছ থেকে না নড়তে। বাঃ, আমি কি ওর মা নই? শত্রু? পারব না মা, নীল আমাকে মাফ করবে না।

আমি কি রত্নকে এই সব বলব? বলা যায়? সাহেব বলতে কী বোঝায় আমার কাছে, কী ধরনের তার উৎপাত, এ সব কোনও মেয়ে বন্ধু হলেও কি বলতে পারতুম? নেই সেরকম কেউ, মেয়েরা আমাকে একটু এড়িয়ে চলে, আমি বোধ হয় একটু অন্য রকমের, কিন্তু থাকলেও কতটা বলতে পারতুম! একটা চেনা নির্যাতনের গল্পের বেশি কে কী বুঝবে? কেউ কি বুঝবে যে গোঁসাইবাড়ি সাহেব ভটচাযের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল ঘটা করে, সেই বাড়িই কেন মামলা তুলে নিল, কেউ আমার কোনও আপত্তিতে কর্ণপাত করল না। কেন? না দেড় মাস যেতে না যেতেই আমি অনুভব করলুম— দ্বিতীয় ধর্ষণজাত সন্তান আমার ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে। আমি জানি, সে বিকৃত, উন্মাদ, ভয়ংকর হবে, যদি না-ও হয়, কেউ আমাকে বাধ্য করতে পারে না এই ঘৃণা ভেতরে লালন করতে, জন্ম দিতে, আমার মা থেকে শুরু করে সবাই এমনকী নীলদা সুদ্ধু বলল— না তুমি গর্ভপাত করতে পারো না, তখন আমি চুপ করে গেলাম, কিন্তু মনে মনে সংকল্প করলুম, না, আর না, এবার আমাকে নিজের ভালোমন্দ নিজের হাতে নিতে হবে, খালি পরের ইচ্ছা পালন করে যাওয়ার জীবন আমি মানব না। কাজেই নির্বিঘ্নে কাজটা সেরে বাড়ি এসে শুয়ে রইলুম, এবং সময় চলে যায়, অথচ ভ্রূণের নিয়মমাফিক নড়াচড়া হয় না দেখে ডাক্তার ডাকার উপক্রম হলে আমি বলে দিলুম, ও আর নড়বে না। বাবুইকে সামনে বসিয়ে

ওরা আমাকে বিশ্বাস করাতে চাইল বাবুইকেই আমি মেরে ফেলেছি, আমি খুনি। মা, আমার মা বললেন— এতগুলি সন্তান আমার অভিপ্রেত ছিল না, তবু প্রত্যেকটিকে প্রাণপাত করে জন্ম দিয়েছি।

আমার চেয়ে বেশি কে জানে মা, তুমি খালি জন্ম দিয়েই সেরেছিলে, বাবারা যেমন সন্তান একটু বড় হলে তার ফায়দা তোলে, তুমিও ঠিক তাই করেছ।

পুরানো মামলার জের টেনেই ডিভোর্স আদায় করলুম, একেবারে একলা একলা। বাড়িতে সবাই আমাকে এড়িয়ে চলে। নীলদাকে খানিকটা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু সে তো তার কর্মস্থলে চলে গেল, আমাকে তো একবারও বলতে পারত, চল খুকু, তুই আমার সঙ্গে চল, ওখানে নতুন করে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা কর, আমি আছি, আমি সে অফারটা নিতুম কি না সেটা আলাদা প্রশ্ন, কিন্তু বলল না তো একবারও। বিলদি এবং লালদা সবচেয়ে রক্ষণশীল আর অসহ্য, তারাই বারবার আসে, আর নানান ভাবে সাহেবের বাড়ি ফিরে যেতে আমায় প্ররোচনা দেয়। ডিভোর্স সেটলমেন্ট হিসেবে আমি এক পয়সাও দাবি করিনি, একদিন বুঝলুম এইটা সবাইকে খুব ভাবাচ্ছে। টুকাই বলল—ছোমাসি একে আমি মামাদের ঘাড়ে পড়ে গেছি, ওরা ভয় পাচ্ছে তুমি আর বাবুইও সেইরকম ঘাড়ে পড়ে গেলে ওদের ভাগে কম পড়ে যাবে। আমার বাবার বাড়ি আমি খাব, পরব, তাতেও অতএব কাঁটা পড়ে গেল। এম এ-র রেজাল্ট আশানুরূপ হয়নি, তারপর স্কুল কলেজে চাকরির অনেক হ্যাপা, এই পরীক্ষা দাও, ওই পরীক্ষা দাও, দিয়ে বসে থাকো, আমার চটজলদি চাকরি চাই। উপার্জন চাই।

রত্নর সঙ্গে এলোমেলো গল্প করছি, তখনই দেখলুম ইউনিভার্সিটি ক্যানটিন চালাবার জন্যে কোটেশন চাইছে। রত্ন এক্স জি এস, ওর সহায়তায় পুরানো ক্যানটিন কর্মীদের নিয়েই একটা কোটেশন দিলুম, এবং পেয়ে গেলুম কাজটা। শুরু হল আমার নতুন জীবন, উপার্জন, সাফল্য, তারপর ছোট দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে হোম সার্ভিসের ব্যবসা। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এই ব্যবসাকে আমি একেবারে পাহাড়-চূড়ায় তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম। ক্রমে দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল ব্যবসা, অফিস, ব্যাংক, টেক অ্যাওয়ে কাউন্টার, আমি আর একা

সামলাতে পারি না। রীতিমতো লাভজনক ব্যবসা। অনেকেই বলল— এবার একটা রেস্তোরাঁ খুলতে। কিন্তু আমি সে পথে গেলাম না। আমার প্রাথমিক নীতি ছিল চাকুরে এবং একা, লোকজনহীন মানুষদের মুখে বাড়ির রান্না জুগিয়ে দেওয়া। সেই লক্ষ্য থেকে আমি সরলুম না। বরং অঞ্চল ভাগ করে করে বসালুম আমার রান্নাঘর। কোনও ফ্র্যানচাইজিও নিলুম না।

এই ব্যবসা করেই আমার এই ফ্ল্যাট কেনা, বাবুইকে নিজের কাছে নিয়ে আসা, গোস্বামীহীন জীবন যাপন। দুলদা বউ মেয়ে নিয়ে আসছে, খুকু আয়, লালদার ছেলের লেট উপনয়ন, খুকু নিশ্চয়ই আসবি, বড্ড কাজ, জানোই তো এ সব আমার একার ঘাড়ে। বিলদির মেয়ের বিয়ে, দারুণ ঘটা, ভুবনেশ্বরে বিয়ে, উত্তরপাড়ায় বউ ভাত, ভুবনেশ্বরে যাওয়া-আসার টিকিট দিচ্ছে বিলদি, তা ছাড়া, ওখানে গেস্ট হাউসে রাজার হালে থাকা। তাই বুঝি? আমার কি মুশকিল হয়েছে জানো? এমন কেউ নেই যাকে ভরসা করতে পারি, তাই... বাবুই? ওমা ও তো কুইজ-কনটেস্ট-এর জন্যে স্কুল থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনিং নিচ্ছে। টুকাই বিয়ে করছে। ছোমাসি আসবি তো? উপায় থাকলে তো! আমি একদিন গিয়ে নিজে তোর বউকে আশীর্বাদ করে আসব। ঠি...ক। কী করব? ওই বাড়ি আমার অথচ আমার নয়, ওই সব মানুষজন আমার রক্ত অথচ আমার কেউ বলে ওরা নিজেদের প্রমাণ করতে পারেনি। উপরন্তু ওরা সাহেব ভটচাযকে প্রতিটি কাজেকর্মে নিমন্ত্রণ করে থাকে। সুসম্পর্ক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা উভয় দিক থেকেই। সংসারের ক্ষমার অযোগ্য ক্রাইম বা পাপগুলো সম্পর্কে ওদের কোনও চেতনাই নেই। সমাজে গণ্যমান্য বা টাকাপয়সাওলা মানুষমাত্রেই ওদের কাছে ক্ষমা পায়। যেমন আমিও পেয়েছি। একদা সৃষ্টিছাড়া, বিবাহিত স্বামীর একদিনের যৌন উন্মাদনাকে মেনে নিতে না পারা, গর্ভের বৈধ সন্তানকে হত্যা করা রীতিমতো ঘৃণ্য আসামি বলে স্থির হওয়া, বাড়ির মধ্যে একঘরে আমি যেদিন নিজের ফ্ল্যাটে পা দিলুম সে দিনই অভিনন্দন এসে পৌঁছাল, কালামনিস্ট হিসেবে যখন চারদিকে নাম ছড়িয়ে যাচ্ছে তখনই আবার রাশি রাশি অভিনন্দন। কার কাছ থেকে? স্বয়ং সুহাসিনী গোস্বামীর কাছ থেকে।

লিখেছেন—

'সে যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাঁধা।
সে যে নাগাল পেলে পালায় ঠেলে, লাগায় চোখে ধাঁদা।
আমি ছুটব পিছে মিছে মিছে পাই বা নাহি পাই—
আমি আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই।'

ভালো। কাব্যি করো। আমার হাজার কাজ। আমার আজকাল পাখির চোখ হয়ে গেছে, লক্ষ্য ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না, পাখির মনও হয়ে গেছে, আকাশ ছাড়া কোথাও উড়ি না।

অতএব নিক অ্যাডামসকে নিয়ে আমায় ঘুরতে হয়। আমি আমার কাজ করব, খালি নিক আমার সঙ্গে এঁটে থাকবে। এইভাবে ছাড়া নিকের কাজ শিখবার এবং করবার নাকি কোনও উপায়ই নেই। এই প্রথম ও ভারতে, বাংলায়, কলকাতায় এল, ও চিনতে চায়। এ যাত্রা যদি কোনও নির্দিষ্ট কাজের কাজ করতে না-ও পারে, চেনাটা তো হবে! এমনই উদার ওর ইউনিভার্সিটি। নিক সঙ্গে আছে বলেই আমার কাজের ক্ষেত্র বদলাতে হয়। এবার কলকাতা। ব্রিটিশ সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে বলে রাজা রাজেন মল্লিকের মার্বেল প্যালেস্ দিয়েই শুরু করি। তারপর সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, জোড়া গির্জা, বিবাদী বাগের সেন্ট জনস চার্চ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল, শহিদ মিনার।

নিক বলল— তোমরা ব্রিটিশদের এখনও এত গুরুত্ব দাও কেন? ইফ য়ু ডোন্ট মাইন্ড।

—ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারত আমাদের নিকটতম অতীত, তা ছাড়া, ফ্যামিলিয়ার থেকে আনফ্যামিলিয়ারের দিকে যাওয়াই তো ভালো।

—আমার কথা চিন্তা করে বলছ?

—একটু তো ভাবতেই হয়।

নিক বলল— ইফ য়ু সে দ্যাট, আমি নূতন বস্তু দেখতেই এসেছি।

আমি এবার দৃঢ় গলায় বলি— দেখাটা তোমার, কিন্তু কাজটা তো আমার! সুতরাং আমার মর্জিমাফিক তোমাকে চলতে হবে নিক। আ'অ্যাম সরি।

ইঙ্গিতটা বুঝে নিল ছেলেটি। জোব চার্নকের সমাধিতে গিয়ে দেখলুম ফুল দিল, বুকে ক্রস আঁকল, আমি কোনওটাই করলুম না। একটু পরে যখন সিমলা

স্ট্রিটে বিবেকানন্দর নবীকৃত বাড়ির মধ্যে ঢুকছি, তখন চোরা চোখে চেয়ে জিগগেস করল, তোমরা কী প্রকারে মৃতদের শ্রদ্ধা জানাও?

আমি বললুম— এক্ষুনি দেখতে পাবে।

অতঃপর জোড় হাতে নমস্কার এবং বারো ঋষির মুর‍্যালের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণামরত ভক্তদের দেখাই আমি।

নিমতলার শ্মশানঘাটেও নিয়ে গিয়ে ওকে চমৎকৃত করে দিই।

আমার লাভ হয়, শেক্সপিয়র, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এমনকী প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পর্যন্ত বাড়ি কীভাবে সংরক্ষিত হয়েছে তার বিশদ বর্ণনা। কোনও কোনওটার ছবিও। ও বলল— এখানে তোমাদের সোয়ামি ভিভেকের ঘর দেখে আমার লেক ডিস্ট্রিক্টের ডাভ কটেজের কথা স্মরণ হচ্ছে। এত ছোট ঘরে ভিভেক কীভাবে তাঁর মিউজিক থেকে ব্যায়াম পর্যন্ত সব কৃত্য করতেন? ডাভ কটেজের ঘর দেখে তুমি বিস্মিত হয়ে যাবে সেখানে কী করে কোলরিজ বা স্কটের মতো অতিথি এসে প্রায়ই থাকতেন। এত নিচু তার চাল যে তোমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য তখন ফায়ারপ্লেস ছাড়া শরীর গরম করার কিছু থাকত না।

আমি বলি— এখানে দেখো গরমের মোকাবিলা করতে কুড়ি ইঞ্চি বা তার চেয়েও বেশি পুরু দেয়াল। উঁচু সিলিং।

এই সব আলোচনাগুলো আমরা করতুম কোনও না কোনও বিশেষ রেস্তোরাঁয় বসে। নিককে বিভিন্ন রকম রান্নার স্বাদ দেওয়ার জন্য এই আয়োজন। সব কিছুর খরচ মার্কিন কনসুলেটের। উপরন্তু আমি গাইড ও এক্সপার্ট-এর মোটা ফিজও পাচ্ছি।



ঘোর বর্ষা পড়েছে এবার। তবু নাকি এটা আসল বর্ষা নয়, নিম্নচাপ। এপ্রিলের শেষ, দিনের পর দিন বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে পড়েই যাচ্ছে অঝোর ধারে। মাধ্যমিকের কদিন ভালোয় ভালোয় কেটে গিয়েছিল। তারপর আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম, এই সময়টায় ছেলেকে নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দেবে, এটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। এতদিন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, এখন ওর একটু ছুটি তো দরকার, তাই ওকে এবং নিককে নিয়ে শান্তিনিকেতন চলে গেলাম। অঝোর বৃষ্টি, সেই সঙ্গে কী বাজ কী বাজ। বাজ পড়ছে আর দিকদিগন্ত কেঁপে উঠছে। এ জিনিস মার্কিন অধ্যাপকটি দেখেনি, সুতরাং সে মুগ্ধ, অভিভূত। এবং এই সুযোগে আমি ওদেব দুজনকে ছেড়ে দিই।

সুদক্ষিণা আমার কলেজ-জীবনের বন্ধু, ওদের এই বাড়ি মোটের ওপর আমার ভরসাতেই থাকে। কারণ ও থাকে দুবাই।

কেয়ারটেকার পরিবারসহ আছে, কিন্তু আসল কেয়ারটেকার আমিই। এখানেই আপাতত আমাদের অবস্থান। বসে থাকি বাড়ির বিরাট পোর্টিকোয়, চারপাশে গাছপালার পত্রশীর্ষ থেকে টুপ টুপ করে জল পড়ছে। হাওয়ায় দোলনচাঁপা আর বকুলের গন্ধ মিলেমিশে আছে। আমি নিজেকে নির্ভার ছেড়ে

দিতে চাই এই আবহের মধ্যে। মাথার মধ্যে শেক্সপিয়র, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বিবেকানন্দ, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এগুলো নিয়ে সংরক্ষণের ওপর একটা লেখা তৈরি করার কথা ভাবছি, তাতে ট্রুম্যান ও তিনমূর্তি ভবন যোগ করা ঠিক হবে কি না, এইসব নানা চিন্তা, এমন সময়ে গেট খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল, ওরা বোধ হয় ফিরল, ফিরে থাকে তো আমার কিছু করবার নেই এখন, কেননা বাবুই আর নিক এখন পরস্পরে মজে আছে। ওরা এখন নিকের ঘরে যাবে, নিকের নানাবিধ অ্যাডভেঞ্চারের ফটো দেখবে এবং সে নিয়ে একেবারে মশগুল থাকবে। কিন্তু আমার সামনেটা আড়াল হয়ে গেল, মুখ তুলে দেখি— সাহেব ভটচায।

ভেতরের ক্রোধ, বিরক্তি, ভয় প্রকাশ না করে জিগগেস করি— এখানে হঠাৎ?

—এখানে আমার মাইনর ছেলে থাকে, ছুটির সময়ে আমার তাকে পাবার কথা। আইনের খেলাপ জিনিসটা ভালো নয়।

আমি ডাকলুম-- লক্ষ্মী! লক্ষ্মী!

--দারোয়ান দিয়ে বার করে দেবে নাকি?

উত্তর দিই না।

আরও কয়েকবার ডাকার পর লক্ষ্মী আসে। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, হাতে একটা খুরপি, খাটো ধুতি পরনে, দেখলে বেশ ডাকাত ডাকাতই মনে হয়। বললুম— এই বাবুকে বাইরের ঘরে বসাও, জল দাও, খোকাবাবুরা এলে ওখানে নিয়ে যেও।

লক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করল। আমার হাতে একটা নোটবই ছিল, কলম ছিল টি-শার্টের গলা গোঁজা। আমি ভাবনা-চিন্তাগুলোকে লিখে ফেলবার চেষ্টা করে যাই। সফল হই না, বলা বাহুল্য। কিন্তু ব্যস্ততা ও উপেক্ষার একটা বিশ্বাসযোগ্য দৃশ্য তৈরি করা যায়। এ ভাবে সাড়ে বারোটা বেজে যায়। এই সময়টা আমাদের খাবার সময়। আমি জীবন ধারণের সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নিয়মগুলো আজকাল মানতে চেষ্টা করি। ভেতরে গিয়ে টেবিলের ওপর সাজানো খাবার থেকে আমার প্রয়োজনমতো ভাত আর মাছ, খানিকটা চচ্চড়ি তুলে নিয়ে খেতে থাকি, আর তখনই অনুতপ্ত নিক ও বাবুইয়ের প্রবেশ ঘটে।

—আমরা ড়াবড়ি খেয়েছি, নিক ঘোষণা করে। তার মুখে অপূর্ব অভিজ্ঞতার হাসি।

—বেশ করেছ, এ বেলা কি তাহলে বাড়ির দ্বিপ্রাহরিক ভোজন বাদ?

—কক্ষনোই না, নিক তাড়াতাড়ি বলে, সুদুমুদু ক্ষুধার একটু দেরি হল।

বাবুই ওদিকে হাসছে।

ওরা হাত ধুয়ে খেতে বসতে যাচ্ছে, লক্ষ্মী এসে জানায়, বাইরের ঘরে বাবুটি খোকাকে ডাকছেন।

—কে? কে মা? বাবুই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বলি— তোমার বাবা, তোমাকে নিয়ে যেতে চান।

—আমি যাব না, মোটেই যাব না, নিকদা আপনি চলুন তো আমার সঙ্গে, আমি আপনার সঙ্গে...

আমি বলি—নিককে নিয়ে যেতে হবে না। তুমি তোমার ইচ্ছে কী সেটা বলে এলেই হবে।

এরই মধ্যে লক্ষ্মী এসে বলল— বাইরের ঘরের বাবুকে কি খেতে ডাকব?

আমি দৃঢ় স্বরে বলি— না।

নিক আড়চোখে আমার দিকে চায়, বাবুই বলে— খাবারটা পাঠিয়ে দাও না মা, উনি ওখানে খান, আমি ততক্ষণ খেয়ে নিই, আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।

—এই খাবার পাঠিয়ে দেওয়াটা কি তোমার ইচ্ছে?

ও একটু থতোমতো খায়, তারপর বলে, উচিত না? না কী?

—আমি তা বলিনি, খাবারটা বাইরের ঘরে যাচ্ছে তোমার ইচ্ছেয়, এইটুকু বলতে চাই।

—তার মানে তোমার এটা ইচ্ছে ছিল না?

আমি চুপ করে একটা প্লেটে খাবার তুলতে থাকি, লক্ষ্মীর হাতে দিয়ে বলি— যাও দিয়ে এসো।

বাবুই ভুরু কুঁচকে খেতে বসে।

একটু পরে লক্ষ্মী পূর্ণ প্লেটে নিয়ে ফিরে আসে, বলে— উনি খাবেন না বলছেন।

আমি বলি— বাবুই তুমি কি পীড়াপীড়ি করতে এখন যাবে?

মাথা নিচু করে খেতে খেতে বাবুই দুদিকে মাথা নাড়ল।

নীরবে খাওয়া শেষ হল। মেজাজটা সবারই খিঁচড়ে গেছে।

হাত মুখ ধুয়ে বাবুই বাইরের ঘরের দিকে চলে গেল। মিনিট দশেক পরে জানলা দিয়ে দেখি তার বাবা হনহন করে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু বাবুই আর এ ঘরে ফিরে এল না। অনুমানে বুঝি ও এখন সোজা নিজের ঘরে চলে গেছে। জামাকাপড় বদলায়নি, বিছানায় শুয়ে পড়েছে, মাথার তলায় হাত, চোখ হয় বোজা, নয়তো কড়িকাঠের দিকে তোলা। ভুরুর কুঁচি শিথিল হয়নি। বেচারা এত দিন বিচ্ছেদের পরও ভালো করে বুঝতে পারে না এই বিচ্ছেদ কেন, এত তিক্ততাই বা কেন, যদিও ও বাবা মানুষটিকে মোটেই পছন্দ করে না। ওকে শিখিয়েছি লোকের নিন্দে করতে নেই, তাই খোলাখুলি বলতেও পারে না কিছু, তবে একদিন বলেছিল, আচ্ছা মা, বাবা একটু গাঁইয়ামতন, না?

আমি বলেছিলুম— গ্রামের লোককে তো গ্রাম্যই বলে, তাতে অসুবিধেটা কী?

—তা নয়, প্রথমত বাবা টাউনের লোক, গ্রামের লোক নয়, কিন্তু আমি গ্রামের লোকের মতো বলতে চাইছি না, গাঁইয়া মানে গাঁইয়া আর কি!

ও বলতে চেয়েছে ভালগার। কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ নেই ঠিকঠাক। ও একদম ঠিক কথাটা বলেছে। তাহলে ওর এখনও এত ভ্রূকুটি কেন?

লক্ষ্মী টেবিল পরিষ্কার করছে। আমি কিছু কিছু জিনিস ফ্রিজে তুলছি। নিক জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বলল—আমার বকুল ভালো লেগেছে এবং কোকিলার ডাক। তুমি জানতে যে খাবারটি ফেরত আসবে, না?

আমি বললুম— ওটা কোকিল নয়, কোকিলা, এটা বোঝার জন্য তোমাকে পুরো নম্বর দিচ্ছি, বকুল ভালো লাগায় বকুল ধন্য হয়নি, তুমিই হয়েছ, হ্যাঁ আমি জানতুম খাবারটা ফেরত আসতে পারে, কিন্তু না এলেও আমি লোকটিকে কোনওরকম প্রশ্রয় দিতে চাইনি। কোনও কোনও লোক ভদ্রতাকে প্রশ্রয় বলে ভুল করে।

নিক বলল— তুমি যে সংরক্ষণের প্রসঙ্গ চিন্তা করছিলে, তাতে উত্তরায়ণ

উল্লেখযোগ্য, আম্রলতাটি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

ভদ্রলোকটি কি এখনও ছিন্ন তার জুড়ে যাবে আশা করেন? তুমি প্রশ্রয়ের কথা বললে তাই বলছি।

আমি বলি— উত্তরায়ণের কথা ভাবছিলুম, কিন্তু ওটা কলকাতায় না, সে ক্ষেত্রে আরও অনেক এ রকম বাড়ির কথা আমাকে ভাবতে হয়, এলাহাবাদে তিনমূর্তি ভবন যেমন, রথীন্দ্রনাথের প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও হয়নি। লোকটি একদিক থেকে যেমন চালাক, অন্য দিক থেকে তেমনই বোকা।

নিক এবার মুখ ফেরায়, বলে, রথী বিষয়ে আমি পড়াশোনা করছি। অধিক প্রতিভাসম্পন্ন মানবদের সন্ততিদের বড়ই কষ্ট। বিচ্ছেদটি তোমারই সিদ্ধান্তে, কারণটি কি লোকটি এখনও বুঝতে পারেননি?

আমি শুধু বলি— কেউ কেউ বড় ভোঁতা হয়। তবে ও লোকটি কিছু বোঝে না এ সংশয় রেখো না, ও ভান করে। রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে তুমি লিখলে আমি সুখী হব। আমার ধারণা, ডরোথিও উইলিয়ামের ছায়ার আড়ালে পড়ে ভুগেছেন, স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথের দিদিও, এই রকম কিছু উদাহরণ জোগাড় হলে তুমি একটা পেপার তৈরি করে ফেলতে পারবে।

—পরামর্শ ভালো, আমি এ নিয়ে ভাবব, কিন্তু তুমিও একটু বাবুইয়ের কথা ভাবলে পারো। ও না তোমার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়।

—তুমি তো দেখলে আমি কীভাবে ওর আতিথ্যের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিলুম।

—সেইসঙ্গে এও বুঝিয়ে দিলে তুমি ওর থেকে এগিয়ে ভাবো।

—সেটাই তো স্বাভাবিক। আমি তো বয়সে বড়। যা হয়েছে তা আমারই হয়েছে।

—বাবুই বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছেছে। ওর অসন্তোষ, কৌতূহল এগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আমি অযাচিত জ্ঞান দিতে চাই না, ডোনট গেট মি রং। আমিও ব্রোকেন হোমের সন্তান। তাই।

আমি অবাক হয়ে বলি— কিছু মনে করো না নিক, তোমাদের দেশে তো ব্রোকেন হোম, বিবাহবিচ্ছেদ একেবারে অতি সাধারণ ঘটনা।

—তুমি কি আমেরিকায় গিয়েছ?

—না।

—তাই জানো না, এর ফলে ওয়ার্স্ট সাফারার হল চিলড্রেন।

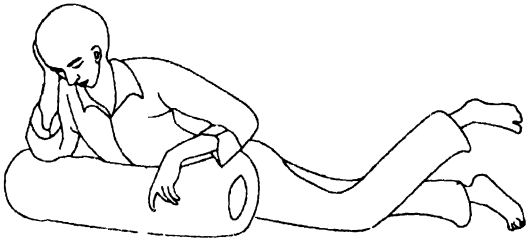
—কিন্তু বাবুইকে তো কষ্ট পেতে হয়নি নিক, ও তো কোনওদিন গৃহহীন ছিল না। মায়ের সান্নিধ্য, যত্ন এ সবেও ওর কোনও অপ্রাপ্তি নেই।

—তুমি মনে করছ নেই। ও মনে করছে আছে। কেননা চারদিকে ও অনেক ওর সমবয়স দেখছে, যাদের পারিবারিক ঐক্য আছে। ওকে অন্তত বলে দেওয়া ভালো, কী অলঙ্ঘ্য বাধার বা অমিলের জন্য ওর পরিবার ভেঙে গেল।

এবার আমার ধৈরজ টুটল, বললুম— সে কথা ওকেও বলা যায় না, তোমাকেও না। স্যরি।

অকুস্থল থেকে চলে আসতে আসতে শুনলুম— স্যরি।

স্যরি স্যরি স্যরি—যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে সুদক্ষিণার বাংলোর কোণে কোণে বাজছে। আমরা সকলেই শুধু দুঃখিতই হতে পারি, আর কিছু পারি না।



নিকের কথা আমাকে সারা সন্ধে সারা রাত ভাবিয়ে রাখল। না, বাবুইয়ের জন্য না। আমি পরিবার ব্যাপারটা নিয়ে কখনও এমন ভাবে ভাবিনি। নিক অবশ্য স্বামী-স্ত্রী-সন্তান ইউনিট বা নিউক্লিয়ার পরিবারের কথাই বলছে। ওদের দেশে যৌথ পরিবারের অভ্যাস অনেক দিন চলে গেছে। তবু ছোট হলেও পরিবার বলে একটা কিছুর কথা নিক ভাবছে, গুরুত্ব দিচ্ছে, কথায় কথায় বিবাহ-বিচ্ছেদের দেশ থেকে ও আমার কাছে, ভাঙা পরিবারের বাচ্চা, বাচ্চাও নয় এখন, একটি কিশোর ছেলের বিষয়ে বিশেষ বার্তা পাঠাচ্ছে, আমি অনুভব করছি, ওর কাছে আমার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ আমার ছেলের অবস্থান। জিনিসটা আমার খুব অদ্ভুত লাগল। আমি একটা বিরাট পরিবারের সন্তান। আমার বাবা আমার চেয়ে ষাট বছরের, মা চল্লিশ বছরেরও বড়। আমার বাবার দুই বিয়ে। বড়দির মা মারা যাবার পরই কি বাবা আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন? এখনও আমার কাছে জিনিসটা স্পষ্ট নয়। মায়ের কোনও কোনও হঠাৎ কথায়, হাবে ভাবে এমন অনেক বিদ্যুৎ চমকাতে দেখেছি যার অর্থ করা মুশকিল। ময়নার সঙ্গে যে বাবার একটা নিষিদ্ধ সম্পর্ক ছিল সেটা আমি মা-বাবার অসুখ-কালীন কথা-বার্তায় আন্দাজ করেছি। আগেও কি আবছা ভাবে বুঝিনি? ময়নাকে আমি সহ্য করতে পারতুম না কেন? এই জন্যেই তো! আমার মা আমার বন্ধুদের মায়েদের মতো ছিলেন না। দাদা-দিদিরাও আলগা আলগা, মানে যৌথ হয়েও যৌথ পরিবারের যে নিরাপত্তা, স্নেহ-ভালোবাসার উত্তাপ সে সব আমি পাইনি, আমার ছেলে বরং আমার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে নিরাপত্তা বা স্নেহের স্বাদ। ওই পরিবারের সবাই ছিল

আলাদা আলাদা, যে যার নিজের তালে ঘুরছে। তাই পরিবার নিয়ে বিশেষ কিছু ইতিবাচক কথা আমি কোনওদিন ভাবিনি। আজ কেন নিক পরিবার নিয়ে আমায় এত কথা বলছে, ভাবতে বাধ্য করছে?

শান্তিনিকেতন থেকে ফেরবার দিন দুই আগে ওর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলবার আমার সময় হল, এমনিতে সারাক্ষণ বাবুই আর ও অবিচ্ছেদ্য। এখানে এসে বাবুই কিছু সমবয়স্ক বন্ধু-বান্ধব জুটিয়েছে। আজ তাদের সঙ্গেই ওর কোনও প্রোগ্রাম আছে। নিকই বলল—তুমি বোধ হয় আমার ওপর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছ রাজ।

ও এতবড় নাম উচ্চারণ করতে অসুবিধে বোধ করে, রত্ন কখনও রাজু কখনও রাজ বলে আমায় ডাকে, তার থেকেই এই ডাকটা পছন্দ করেছে ও।

আমি চুপ করে আছি দেখে ও বলল— জানি, তোমার ব্যক্তিগততে আমার প্রবেশ উচিত হয়নি। আসলে আমি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। খুব সম্ভব, মডার্ন পৃথিবীর চলন আমি মান্য করতে পারি না। আমি মানুষকে ভালোবাসি আমার সীমার বাইরে, তার সীমার বাইরে গিয়ে। এ জন্য কিছু অসুবিধা তো আমার হয়ই, কিন্তু কিছু সুবিধাও আছে। আমি অজস্র পাই, ফেরত পাই, ভালোবাসায়, বন্ধুতে, বিশ্বাসে, আনুগত্যে। তা ছাড়াও আমার কিছু অন্য পাওনা আছে, আমি অনেক মানুষের ভেতরটা পরিষ্কার চিত্রের মতো দেখতে পাই। এখন যেমন তোমাকে দেখছি, তুমি একটি অশ্ব, বন্য, স্বাধীন, কিন্তু তুমি যূথ ছাড়া। এবং উদ্‌ভ্রান্ত, যদিও পেশল উচ্চশ্রেণির কোনও জীবের মতো তোমার অহংকার আছে, জেদ আছে, সব কিছু অস্বীকার করবার জেদ। রাজ তোমার ভয়ংকর একাকিত্বের শোক দিয়েই আমি তোমায় প্রথম চিনেছি। এবং সেই চেনাই সত্য চেনা। একদম মর্ম যাকে বলা হয়, সেই মর্মের চেনা।

এবং বাবুইকে আমি দেখছি— সে একটি গো শাবকের মতো। এখন চঞ্চল, খুব বেশি নির্ভরশীল থাকতে চায়, মাতৃস্তন্যের জন্য ও হামলায়। কিন্তু সমাজ ও কাজের চাহিদা ওকে ক্রমশ বঞ্চিত করে যাচ্ছে, ওর সামনে যদি একটি মায়ের প্রতীকও রেখে দেওয়া হয়, ও সেটিকে অনুসরণ করে যাবে, এত অনুগত। এবং বড় হলে এই আনুগত্য ও ফিরিয়ে দেবে, ওর সঙ্গিনী, সন্তান এদের কাছে ও থাকবে চির-বিশ্বস্ত, বন্ধুরা ওকে ভরসা করতে পারবে, বড়রা নিজেদের জীবনের মানে খুঁজে পাবে প্রতিনিয়ত ওকে পেয়ে। ও মানুষের প্রথম অর্থপূর্ণ সৃষ্টি—

সমাজ, যা সবাইকে ভরণ করে, আশ্রয় দেয়, তাইতেই ওর চরিতার্থতা। ও গো-মাতা নন্দিনী। এবং তুমি উচ্চৈঃশ্রবা, ইন্দ্র ছাড়া কারও বশ্যতা স্বীকার করবে না। সেখানেও তুমি ব্যক্তিগত বীরত্বকামী। আসলে তুমি জীব-সমুদ্র মন্থন করে ওঠা প্রাণ, যে সর্বদা উচ্চমুখ, উচ্চনাদী।

আমি চিত্রার্পিতের মতো ওর এই অদ্ভুত পুঁথিসম্ভূত বাংলা শুনছিলুম, শুনছিলুম ওর বিশ্লেষণ, আর একটা ঘোরে পড়ে যাচ্ছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল আমি আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছি, যে আকাশকে সর্বক্ষণ মনে মনে কল্পনা করি এ তেমন নয়, শুধু যে এর বিরাট বিস্তার তাই নয়, এ আকাশ শূন্য নয়, ব্যাখ্যাতীত রকমের ভরা, চারদিক থেকে যেন তুলোর মতো নরম অথচ কাচের মতো দৃঢ় কিছু আমাকে ঘিরে ধরেছে। আকাশ এ রকম আমি কল্পনা করতে পারিনি। আকাশের কী দায় আছে যে সে আমাদের কল্পনামতো হবে! এই ঘরের মধ্যে আর আমি যেন নিজেকে ধরাতে পারছি না। মনুষ্যত্বের সীমা বাড়তে বাড়তে অসীমের দিকে চলেছে। আমি যেন প্রাগৈতিহাসিক, পৌরাণিক বিশ্বের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছি। এই সেই মিসিং লিংক, যা আমাদের চেতনার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে, মহাপৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যুক্ত করছে, অতর্কিতে সেই অর্থ উদ্‌ঘাটিত হয়, তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তারপর? তারপর কি আবার তুচ্ছতায় ফিরতে পারা যায়? না কি ফেরার দরকার আছে!

—কী হল? নিক আমার কাছে এগিয়ে এসেছে। আমি হাত তুলে ওকে চুপ করাই। দুজনেই মুখোমুখি বসে থাকি। এইভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর আমার বাক্‌-স্ফূর্তি হয়। আমি আস্তে আস্তে বলি— নিক, তুমি বোধহয় আমাকে আমার মৌলিক স্বভাবের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে, আমি এতদিনে নিজেকে বুঝতে পারছি।

ও আরও আস্তে বলল— তুমি বোধ হয় কোনও যূথের খোঁজ পাচ্ছ, হারিয়ে গেছে বহু কালের, দেশের জঙ্গলে, একলা একলা ছড়িয়ে পড়েছে এখানে ওখানে, খুঁজতে হয়, তা-ও জানে না, নিজের একাকিত্বেই গর্বিত, কিন্তু সত্তার গভীরে কোথাও জানে সে এক বিপন্ন প্রাণী।

—কিন্তু তুমি তো এ রকম কোনও বিপন্ন প্রাণী নও নিক, তুমি কী করে এই খোঁজ পেলে?

—কে বলেছে তোমায় আমি বিপন্ন প্রাণী নই! তোমার মতো নই, কিন্তু আমিও আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হওয়ার পথে। শোনো রাজ, আমি যখন নিতান্ত ছোট ছিলাম, আমার অনুভব হত আমি বড়, অনেক বড়। আমার মায়ের চোখে উচ্ছৃঙ্খলতা, বাবার চোখে ক্রোধ, ঈর্ষা আমি কাচের মতো স্বচ্ছতায় দেখতে পেতাম। আমার ধাঁধা লাগত, খালি মনে হত এরা আমার বাবা-মা নয়, এরা ভুল, এরা আমার দয়ার পাত্র। হাজার চেষ্টা করেও এদের আমি বদলাতে পারব না, এদের থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত থাকাই আমার নিয়তি। তাই ওরা যখন আলাদা হয়ে গেল, আমার তখন বারো বছর বয়স, দুজনেই আমার অধিকার চাইল, আমি কোর্টকে বললাম আমি হোস্টেলে থাকতে চাই, আর্থিক ভার কে বহন করবে আমি জানি না, কিন্তু আমি দুজনেরই, ও সেই সম্পর্ক বজায় রাখতে আমি দুজনের থেকেই স্বতন্ত্র থাকতে চাই। আমি কোনওদিন ওদের বুঝতে দিইনি আমি ওদের কারও নই, যতদিন ওরা আমার ব্যয় বহন করেছে, আর মনে করেছে এই তো ছেলেটি একান্তই আমার হয়ে গেছে, ওকে আমরা অনেক দিচ্ছি, আমাদের মধ্যে মিলমিশ থাকতে না পারে, কিন্তু আমরা আদর্শ বাবা মা, আমি ওদের ভাবতে দিয়েছি। ওরা দুজনেই আবার বিয়ে করল, আবার ভাঙল, আবার বিয়ে করল আবার ভাঙল, সমস্ত সময়টা আমি পড়তে লাগলাম, শুধু পাঠ্য নয়, যেখান থেকে যা পাই, সেইসঙ্গে ভাবতে থাকি, ভাবতে থাকি। তারপর হাই স্কুল পাশ করবার পর আমি অড জবস করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলাম, সেই সময়ে একদিন আমি আমার বাবাকে দেখতে পাই। তিনি বৃদ্ধ, সেন্ট্রাল পার্কে বসেছিলেন গুটিসুটি হয়ে, তাঁর সঙ্গের স্পানিয়েলটি থেকে থেকে ঠান্ডায় চিৎকার করছিল। আমি তাঁর সাহায্য প্রয়োজন ভেবে এগিয়ে যাই, তারপর তিনি আমার দিকে তাকালেন, আমি দেখলাম তাঁর চোখের আশ্চর্য উজ্জ্বলতা যা ওই বয়সে মানুষের থাকে না। এবং দেখতে পেলাম তিনিই আমার প্রকৃত বাবা। আমাদের মধ্যে এইরকম কথাবার্তা হল :

—এক্সকিউজ মি, খুব ঠান্ডা পড়েছে, এবার কিন্তু আপনি উঠে পড়ুন, আমিও এবার চলে যাচ্ছি, বন্ধ হয়ে যাবে পার্ক।

—ধন্যবাদ মাই সন, নিশ্চয় উঠব, আমি একটি প্রতীক্ষায় আছি, ছিলাম। প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে।

আমরা তিনজনেই পার্ক থেকে বেরোতে লাগলাম। আমি কোনও তাড়া

করিনি। ওঁর সঙ্গে তাল মিলিয়েই বার হচ্ছিলাম। বেরিয়ে উনি আমায় জিগগেস করলেন— তুমি কোথায় থাকো?

আমি আমার ঠিকানাটা বললাম। উনি আমার দিকে একবার তাকালেন, সেই উজ্জ্বল চোখ, তাকে অন্তর্ভেদী বলতে পারি না। কেননা তার মধ্যে তীক্ষ্নতা ছিল না। কিন্তু তিনি যে আমায় ভালো করে বুঝে নিচ্ছেন এক বিরল প্রজ্ঞা দিয়ে, সেটা আমার কাছে স্পষ্ট ছিল। উনি বললেন— আমার বাড়ি খুব দূরে নয়, তোমার যদি খুব অসুবিধে না হয় তো আমার বাড়ি না হয় একটু চা খেলে! ওঁর বাসস্থান ছিল, ফর্টি সেভেন্থ স্ট্রিটের সংলগ্ন একটি গলিতে, আন্ডারগ্রাউন্ড দিয়ে সেখানে পৌঁছালাম, আমার ওঁর সঙ্গ ভালো লাগছিল, একটি বহুতলের পনেরো তলায় ওঁর বাস। এটা আমি আশা করিনি, কারণ ওঁকে দেখে বৃদ্ধাবাসের বাসিন্দা বলেই মনে হয়। সেই প্রথম আমি ভারতীয় গৃহসজ্জা দেখলাম রাজ। উজ্জ্বল রাজস্থানি আবরণ ডিভানে, দেয়ালে বুদ্ধপুরুষ ও ভিভেকের ছবি, বাটিক বস্ত্রে। ছৌ মুখোশ ও মাটির ঘোড়া ছিল, কাঠের চৌকির ওপর পিত্তলের ঘণ্টা, শঙ্খ, রেকাবিতে পুষ্প ছিল। কয়েকটি গদি দেওয়া কাঠের চেয়ার ছিল, বহু পুরানো স্টাইলের, উনি পড়াশোনা করতেন শক্ত কাঠের চৌকির ওপর বিছানায় একটি ডেস্ক পেতে, কিন্তু চেয়ার টেবিলও ছিল। দুটি ঘর ও একটি ছোট্ট রান্নাঘর ও টয়লেট। সেই যে ঢুকলাম, রাজ, আমি আর বেরোইনি। ওঁর কাছেই আমার বাংলা শিক্ষা, এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে আগ্রহের উৎপত্তি। আমি আস্তে আস্তে বুঝলাম, এই পৃথিবীতে পরিবার পরিবারে জন্মায় না। বাবা মা ভাই বোন দাদা দিদি এই সমস্ত সম্পর্কগুলি ছড়িয়ে থাকে সারা জগৎ জুড়ে, তাদের খুঁজে পেতে হয়।

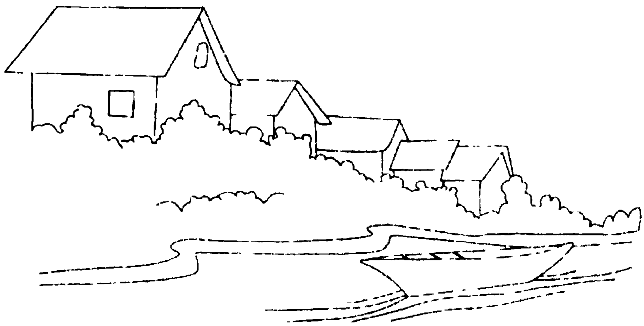
আমি বললুম— আর কোন কোন সম্পর্ক খুঁজে পেলে নিক?

আমার গলায় কি সামান্য প্রগলভতার আভাস ছিল?

নিক বলল— এখনও খুব বেশি কাউকে খুঁজে পাইনি। সবাইকে পাওয়ার মতো সৌভাগ্য বোধ হয় কারওই হয় না। তবে একজনের খোঁজ পেয়েছি, মাই সন, আর যখন একবার পেয়েছি, ওর জন্মদাতা পিতামাতার থেকে চৌম্বক টানে, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ও আমার দিকে আসবেই। আমাদের শুধু অপেক্ষা করতে হবে। হি ইজ বাবুই।

—তুমি ঠিক বুঝেছো?—আমি অবাক হয়ে বলি।

ও বলল—ইয়েস্‌স্‌।



বর্ষা শেষ হয়েও হতে চায় না, আকাশে জলভরা মেঘ চরছে তো চরছেই। সেই মেঘ ঝরছে তো ঝরছেই। আমি আমার ভেতরের একান্ত স্তব্ধতার ভিতরে নিরন্তর বসে থেকে খাটছি তো খাটছিই। মোট পাঁচটা নিবন্ধ বেরিয়ে গেল। আরও পাঁচটা তৈরি। আরও গোটা ছয়েক তৈরি হওয়ার পথে। সুদেবদা খুব উৎসাহিত এবং উত্তেজিত। উনি বলতে শুরু করেছেন, এর পাশাপাশি তুমি অন্য লেখায় হাত দাও রাজেশ্বরী। বাংলা সমালোচনা সাহিত্য এখন খুব দুর্বল। তুমি সিরিয়াসলি সমালোচনার কথা ভাবো। বেশ কিছু বই উনি গছিয়ে দিয়েছেন আমাকে। লেখাগুলো সব ইংরেজিতে অনুবাদ করবে রত্ন, বিদেশি পত্রিকায় সেগুলো ছেপে বাংলা, এবং ক্রমশ ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কেও একটা আন্তর্জাতিক আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে চাইছেন সুদেবদা। নিক অনুবাদগুলোয় সাহায্য করবে, তাদের প্রকাশনাতেও, কথা দিয়ে গেছে।

গোঁসাই পরিবারের সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার কথা আমি আপাদমস্তক ভুলে গিয়েছিলুম।

ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি থেকে সারাদিনের মনোযোগসম্ভব একটা অন্যমনস্কতার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র অভ্যাসের নৈপুণ্য ব্যবহার করে বাড়ি ফিরছি, আমাদের ফ্ল্যাট বাড়ির কেয়ারটেকারের পাশ থেকে দুই মূর্তি উঠে দাঁড়াল। টুকাই আর চয়ন।

—এ কী, তোরা? কতক্ষণ এসেছিস?

—অনেকক্ষণ।

—তো ফোন করে এলি না কেন? কখন কোথায় থাকি!

—তোমার ফোনও তো কখন কোথায় থাকে ছোমাসি! সারাদিন চেষ্টা করেছি, পাইনি।

তখন আমার খেয়াল হয়, লাইব্রেরিতে তো ফোন বন্ধ করে রেখেছিলুম।

—দ্যাখ তো তোদের কী হয়রানি হল। ফোন যখন পেলি না রাতে আরেকবার করে একটা দিন ঠিক করে আসতে হয়।

—সেই জন্যেই তো অফিস-আওয়ারের পরে এসেছি। বাবুই কোথায়?

—ওর বোধ হয় প্র্যাকটিক্যাল আছে। একটু পরে আসবে।

ওরা বলে— ফোন করে দিন ঠিক করে আসার আর সময় ছিল না মাসি। না হলে তোমায় বিরক্ত করি?

তিনজনে লিফ্‌টে উঠি। —কী আবার হল?

—ভেতরে ঢুকি, তারপর বলব।

আগে আতিথেয়তা করি। চা বানাই, ফোন করে আমার নিকটবর্তী 'রান্নাঘর'-এর শাখা থেকে চিকেন-রোল আনাই।

—অপূর্ব তো রোলটা! দুজনেই বলে। —পরোটাটা খুব খাস্তা নয়, অথচ না টেনে-হিঁচড়ে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই খাওয়া যায়, চিকেন পিসগুলো রসালো, দারুণ খেতে, পেঁয়াজ-শশাগুলো খেতে গিয়ে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে না, কোথায় এমন রোল পেলে ছোমাসি?

আমি বলি— 'রান্নাঘর।'

—তোত্তোমার সেই? ফার্স্টক্লাস তো! এ রকম ব্যাপার যে আমার ধারণাই ছিল না। আসলে আমরা তো আর এখানে থাকি না যে অত ডিটেল জানব। ভীষণ নাম, না?

—ভীষণ নাম কী করে হবে রে? এটা তো কোনও রেস্তোরাঁ নয়, বসে খাওয়ার জায়গাও নয়। হোম সার্ভিস, টেক অ্যাওয়ে আছে, কিছু কিছু কেটারিং-এর দায়িত্ব আজকাল নেওয়া হচ্ছে।

—এত ভালো রান্না কোথা থেকে শিখলি মাসি, আমি তো তোকে খালি

র‍্যাশন, বাজার, দোকান করতে দেখেছি।

আমি হেসে বলি— যাক, খানিকটা দেখেছিলি, বাকিটা দেখতে পাসনি, মানুষের একটা ব্লাইন্ড স্পট তো থাকে! আর রান্না? শিখেছিলুম বড়দির কাছ থেকে।

—বড়দি? মানে আমার মা? তিনি তো কবেই...?

—ওই তো মজা, যাঁর শেখাবার আর যার শেখবার তারা একত্র হলেই বাকিটা আপনা-আপনি হয়ে যায়। তবে এখন তো আর 'রান্নাঘর' আমার· রান্নায় চলে না। আমার খালি নির্দেশটুকু থাকে।

চয়ন বলে— আমাদের যে বড় সে দিন মুড়ি দিয়ে সেরে দিলে?

—আরেক দিন আসিস। আজই বা জারিনকে নিয়ে আসিসনি কেন?

কাঁচুমাচু মুখ করে চয়ন বলল— ও আর কোনওদিনই আসবে না মাসি। আমাদের সম্পত্তি পাওয়া-পাওয়ির মধ্যে ও একেবারেই থাকতে চায় না। ও এ কথাও বলছে, দলিল হাতে পেলে আমি যদি সেটা আমার মাকে দানপত্র করে না দিই, তো ও কখনও সে সব টাকা-পয়সার আওতায় থাকতে চায় না। তেমন তেমন হলে... চয়ন চুপ করে গেল।

—তেমন তেমন হলে কী?

—তেমন তেমন হলে ও-ও আমার সঙ্গে থাকবে না আর।

—আমার সে দিনের কথায় এত রাগ করল?

—না না রাগ নয়, ও বলছে ছোটমাসি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।

টুকাই বলল— বাজে কথা রাখ। আমরা ভীষণ বিপদে পড়েছি ছোমাসি। বিলমাসি দিদাইকে নিজের কাছে কদিন রেখে আদরযত্ন করতে চাইল। আমি আটকে রেখে দেবার কে বলো? দিদাই গেল, তারপর শুনছি ওরা দিদাইকে দিয়ে নালিশ করাবে আমি আর চকাই দিদাইকে চাপ দিয়ে আমাদের ফেভারে সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়েছি, ফৌজদারি মামলা হবে আমাদের নামে।

—বলিস কী? মা সেটা করবে কেন? নিজে যে কাজটা করল সেটা অস্বীকার করবে? মিথ্যে কথা বলবে? তোদের এ কথা কে বলল? যদি এটা হয় তো সেটা এক রকম গোপন ষড়যন্ত্র, তোদের বিপদে ফেলার জন্যে করা, তোদের তো জানতে পারার কথা নয়?

চয়ন বলল— আমার মা মেসেজ পাঠিয়ে সাবধান করেছে, তোমার

পরামর্শ নিতে বলেছে, মাসি এ সব মতলব দিয়েছে সাহেব মেসো।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি— সাহেব বুঝলুম, কিন্তু মেসো কী সুবাদে? চয়ন তোরা তো এ যুগের ছেলে, আইনি বিচ্ছেদের পরেও আইনি সম্পর্ক-নাম ব্যবহার করলে আমাকে অপমান করা হয়, সেটুকুও বুঝিস না? যা, তোদের সমস্যা তোরা সামলাগে যা। আমায় রেহাই দে।

দুজনেই চুপ করে গেল। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। শেষে টুকাই বলল— আমরা কিন্তু অতশত ভেবে কথাটা বলিনি মাসি। প্লিজ, আর এ রকম ভুল করব না। তুই আমাকে শুধু শুধু জেল খাটতে যেতে দেখতে পারবি?

আমি বললুম— দ্যাখ টুকাই, তুই আমার বোনপো যেমন তেমন ছোটবেলাকার সঙ্গীও বটে। দেখেছিস স্বচক্ষে কী হয়েছে আমার ওপর, কী গেছে, কোনওদিন তোকে প্রতিবাদ করতে দেখিনি, ফিল যে করছিস এইটুকু হয় তো বুঝেছি। ব্যাস। কী রকম মানুষ তুই যে তোকে আমি আজ একই রকম ইনসেনসিটিভ দেখেও সাহায্য করব!

টুকাই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল— সত্যি কথা বলতে তোর ব্যাপারটা আমার কাছে আজও পরিষ্কার নয়। চিরকাল দিদাইয়ের ওপর নির্ভর করেছি, দিদাই বলত মেয়েটা ভুল করল, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে স্বাধীনভাবে জীবন উপভোগ করতে পারত, কী যে গোঁ! করল না। আমি সত্যিই ওটা নিয়ে ভাবিনি। আর আমার তো কোনও আলাদা টাকা-পয়সা কোনও ভরসা ছিল না যে আমি তোকে সাহায্য করব! কিন্তু কষ্ট পেয়েছি। মাসি আমায় বাঁচা। প্লিজ।

আমার কেমন এক ধরনের করুণা হল। কী, কী এরা? কী রকম মানুষ, কী রকম পুরুষ? অথচ এই টুকাই মহর্ষির নাতি, বড়দির ছেলে, যে মহর্ষি একলার বুদ্ধিতে অত উপার্জন করেছিলেন, নিজের লাইফ স্টাইলের জন্য যিনি লোকের নমস্য ছিলেন। যে বড়দি পৃথিবীতে আমার দেখা সব মেয়েদের মধ্যে এখনও সবচেয়ে মানবীপ্রতিম, ভাগ্যের মার খেয়েও কোনওদিন মর্যাদা হারাননি। এরা কত ছোট মাপের!

বললুম—আমাকে কিছুদিন সময় দে। ধর দুদিন, কিছু একটা ওয়ে আউট

আমি বার করবই। কিন্তু সেটা তোদের মেনে নিতে হবে। এইটুকু কথা দিচ্ছি যে তোদের স্বার্থের বিরোধী হবে না সিদ্ধান্তটা। তবে, কিছু পেতে হলে কিছু ছাড়তেও হয়। মেনে যদি নিতে পারিস, বল, নয় তো আমি এ নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নই, আমার অনেক কাজ আছে।

দুজনেই একবাক্যে রাজি হয়ে গেল।

ওরা উঠবে উঠবে করছে। অথচ উঠছে না। বাবুই ফিরল। হাত মুখ ধুয়ে চা বসাল— তোমরা আর খাবে? আমাদের জিগগেস করল। ওরা দুজনেই আরেক কাপ চায়ে রাজি। আমি বাবুইয়ের রোলটা মাইক্রোতে বসিয়ে দিয়ে চান করতে চলে গেলুম।



কী চান? কী চান উনি? উনি কি মানুষ? স্বাভাবিক মানুষ? না কোথাও একটা ঘাটতি থেকে গেছে। আমরা এতদিনেও বুঝতে পারিনি মানুষটা আসলে বোধহয় পাগল। এও হতে পারে ওঁর ভীমরতি ধরেছে। এই রকম মানুষকে যদি ভীমরতিগ্রস্ত বলে বোঝা না যায় তা হলে খুব বিপদ। অথচ আমি মন থেকে মেনে নিতেও পারছি না যে মা সত্যিই কোনও মানসিক অক্ষমতায় ভুগছেন। তা যদি না হয়, তাহলে মেনে নিতে হয় আরও ভয়ংকর একটা সম্ভাবনা। উনি সাক্ষাৎ শয়তান। কিছুই ওঁর আটকায় না। কিন্তু শয়তানেরও তো কোনও উদ্দেশ্য থাকবে? ওঁর উদ্দেশ্যটা কী? স্বার্থটাই বা কী? এই বয়সে ওঁর আলাদা করে পাবারই বা কী আছে? চাইবারই বা কী থাকতে পারে শান্তি সেবা আর আরাম ছাড়া? প্রভুত্ব? প্রভুত্বই যদি চাই তো জীবিত থাকতে থাকতে সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে দিলেন কেন? কোনও প্রয়োজন ছিল না তো! উইল করে যেতে পারতেন, না করতে চাইলে ওঁর মৃত্যুর পর যা হবার হত, সে নিয়ে মাথা ব্যথা করবার তো কোনও কারণ দেখি না।

টুকাই বহুদিন ওঁর সঙ্গে ঘর করছে, যখন মহর্ষি নেই, বাইরের লাইফ নিশ্চয় অতটা নেই আর, এখনকার সুহাসিনীর কথা টুকাইয়ের আমার চেয়ে ভালো জানা উচিত। ওকে জিগগেস করে একটু বোঝবার চেষ্টা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমার মনটা এমন অন্য জায়গায় পড়ে আছে যে এ সব ইচ্ছে বা দরকারের কথা মনে আসেনি। অথচ এখন সে সব অর্থাৎ মোটিভ না

জেনেই আমায় কাজে নামতে হবে। না হলে ছেলে দুটো সত্যিকারের বিপদে পড়ে যাবে। দলিলগুলো একটু দেখা দরকার, ওরা এনেছিল, আমি বলেছিলুম রেখে যেতে।

ভাবতে ভাবতে প্রথম যে ধাঁধাটার আমি সমাধান খুঁজে পেলুম, সেটা হল, ফুলদির ম্লান মুখের রহস্য। ফুল নিজেকে জাহির করতে পারে না কোনওদিন, কেউ কিছু বলে দিলে সেটা পালন করতে পারে, বিচার করতে পারলেও সেটা প্রয়োগ করতে পারে না। ফুল সেই রকমই রয়ে গেছে, শুধু একটা জায়গায় ওর মায়া এত শক্তিশালী যে ও বিচার করেছে এবং নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই দুর্বলতম ও শক্তম জায়গাটা স্বভাবতই ওর ছেলে। ছেলেই ওর দ্বন্দ্ব। জারিনকে মেনে নিতে পারছে না এটা যেমন সত্যি, ছেলে জেলে যাক বা বঞ্চিত হোক এটাও ওর মনোমতো নয় একেবারেই, তাই ফুল গোঁসাইদের সঙ্গে থেকেও একটু অ-গোঁসাই ছিল সে দিন। যাক, একটা একটা করে সলভ করা যাবে অঙ্কগুলো।

সারা রাত ভেবে ভেবে ঘুম হল না ভালো। ভোরের দিকে একটা সমাধান ভেসে এল। অর্থাৎ সারা রাত আমি না ঘুমিয়ে চিন্তাই করে গেছি, চিন্তাই করে গেছি। ঘুম থেকে উঠেই আগে টুকাইকে ফোন করলুম— টুকাই তুই আর চয়ন দুজনেই অবিলম্বে আমাকে তোদের শেয়ার বেচে দিতে পারবি?

একটু চুপ থেকে ও বলল— পারব।

—তাহলে চয়নের সঙ্গে কথা বলে নে। এই সিদ্ধান্ত নিলে স্থাবর অস্থাবর যা কিছু সম্পত্তি মায়ের দরুন তোদের আছে, সব আমার নামে ট্রান্সফার হয়ে যাবে মনে রাখিস। সিদ্ধান্তটা নিয়ে আমায় ফোন কর, তাড়াতাড়ি যা করার করতে হবে।

আমার হঠাৎ সেই দৃশ্য মনে পড়ল। বাবার ইচ্ছাপত্র পড়া হচ্ছে আর রাগে লাল মুখে দোলন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি আচমকা বুঝতে পারি আমি অনেক ছোট ছিলুম বলে আমার দাদা-দিদিদের অনেককেই ঠিকঠাক বুঝতে পারিনি। দাদা-দিদি মানে দাদা-দিদিই। তাদের আপন হাতে বিচার করার ক্ষমতা যে আমার একেবারে ছিল না তা নয়, আমি তো

প্রত্যেককেই বুঝতে চেষ্টা করতুম। কিন্তু তার মধ্যে একটা পূর্বসংস্কার কাজ করত। ওরা দাদা-দিদি। হয়তো বা অনেক বড় দাদা-দিদিদের এমনিই লাগে ছোটদের! আমার বোধের বাইরের মানুষ ওরা। এখন বুঝি বাবার অনেক সম্পত্তি বলে ওই মানুষগুলির মধ্যে একটা উদ্যমহীন অহংকার জন্মেছিল। ওরা জানতই যে শেষ পর্যন্ত ওদের বাবার টাকা আছে। এত বোকা ও অলস সেই সম্পত্তিটা ঠিক কত মূল্যের, কীভাবে তার দেখাশোনা করতে হয়, এ সবেও ওদের বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না। যেন যেহেতু পিতৃসম্পত্তি তাই রুপোর থালায় করে কেউ যথা সময়ে ওদের হাতে সব ঠিকঠাক তুলে দেবে। তাই একদম ছোট থেকে ওরা বড়লোকের ছেলের নিষ্ক্রিয় মানসিকতা নিয়ে দিন কাটিয়েছে, যদিও আমাদের বাড়ির হালচালে কোনও রকম বড়মানুষি কোনওদিন ছিল না। ওরা ভাবত বাবাকে যেতে দাও, আমরা নবাবি করব যে যার নিজের মতো। সেটা যখন হল না তখন ভাবতে শুরু করল মাকে যেতে দাও, তারপর, আর ওদের এই মানসিকতায় ইন্ধন জুগিয়েছে সমানে ওদের বউয়েরা। এখন তাই ওরা মরিয়া হয়ে গেছে। ভাই বোনে বিষয়ের জন্যে লাঠালাঠি, খুনোখুনি আর কী এমন অস্বাভাবিক ঘটনা আজকের দিনে! আজকের দিনই বা কেন? চিরকাল এ জিনিস হয়ে এসেছে। এ ক্ষেত্রে ভাই বোনরা একত্র হয়েছে তাদের ছেলেদের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতিটা এই খানে ভিন্ন। লোভ, লোভ শেষ পর্যন্ত। সেই তৃতীয় রিপু।

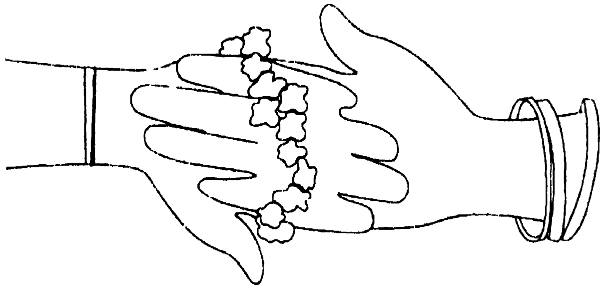
কয়েকটা ফোন করে নিলুম, তার মধ্যে একটা অবশ্যই রত্নকে। কারণ রত্ন আমাকে বলে দিয়েছে রত্ন হ্যাজ। রত্ন খুব উপায়কুশল অর্থাৎ রিসোর্সফুলও বটে। ওর হাতের কাছে নানা প্রোফেশনের কুশলী লোকেরা। তাঁদের মতামত পেতে আমার অসুবিধে হল না। বিকেল নাগাদ চয়ন, টুকাই আলাদা করে ফোন করল আমাকে। উভয়েই রাজি। টুকাই বিষয় সম্পত্তির হাওয়ায় এতদিন বাস করছে, ও বোধ হয় আমার চালটা কিছুটা ধরতে পেরেছে।

সুতরাং পরের দিন সকালেই আমি তারকেশ্বরে রওনা হয়ে গেলাম। দুদিনের মধ্যে সাহেব ভটচাযের বিরোধী ক্যাম্পের উকিল ঠিক করা, স্ট্যাম্প পেপার কেনা, এবং স্ট্যাম্প পেপারের দরুন খরচ ছাড়া এক পয়সাও বেশি ব্যয় না করে মহর্ষির সমস্ত সম্পত্তি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা, জোর জবরদস্তি করে

যাকে অসাব্যস্ত পাত্রে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নির্যাতিত হয়ে যাকে শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়ির আশ্রয় পাওয়ার, সমর্থন পাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পথে একা নামতে হয়েছিল, সেই কন্যার হাতে চলে এল। টুকাই বলল— মাসি শেষ পর্যন্ত তাহলে দিদাইয়ের আর দাঁড়াবার জায়গা রইল না।

—নাঃ। এইবারে শুরু হবে সকল চেনাচেনির খেলা।

বেশির ভাগই ভূ-সম্পত্তি। ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে বেশ কিছু। আমি ওদের জমির দালাল খুঁজতে বলে চলে এলুম। উপরক্ত মিউটেশনের জন্য দরখাস্ত করলুম।



সুতরাং এই আমার জন্মলব্ধ পরিবার। এদের সমস্তটাই গা-জোয়ারি, সমস্তটাই কুটিল স্বার্থ-প্রণোদিত। নিকের পরিবার-তত্ত্ব আমাকে শয়নে স্বপনে জাগরণে অশরীরী এক ইচ্ছাশক্তির মতো তাড়া করে। কী যে পাইনি তা যেন এতদিন জানতুম না। হঠাৎ এক অলৌকিক উদ্ভাসে জেনেছি। ভিতর থেকে এক গভীর আকুলতায় দীর্ণ হয়ে যাচ্ছি। অথই পারাবার। আমি শুধু বৈঠা বেয়ে যাই। জল উঠে আসে আমার সামান্য পানসিতে, সেঁচে ফেলে দিই, সেই সঙ্গে দেখি আকাশ বাতাসের মেজাজ বদল, অন্য কত নৌকা যারা কম্পাস হারিয়েছে, তাদের ক্যাপটেন মৃত, খোলে কী মাল আছে তারা ভুলে গেছে, কোথায় যাওয়ার কথা ছিল তা-ও। তারা অনন্তকাল ধরে শুধু এস ও এস পাঠাতে জানে, রেডিও আর্ত চিৎকার করে যাচ্ছে— এস এস ভাইকিং, কারগো শিপ, উই আর লস্ট, অক্ষাংশ দ্রাঘিমা জানি না, আটলান্টিকে ভাসছি, রসদ ফুরিয়ে এসেছে। প্লিজ লোকেট আস। তাকে চাপা দিয়ে ভেঙে পড়ে আর একটা স্বর— আমরা ক্রমশ আইস বার্গের দিকে ভেসে চলেছি, হেল্প হেল্প।

কীভাবে সাহায্য করতে পারি সেই কথা ভাবতে ভাবতে আমার নিজের তরণী হাল ছাড়া হতে চলল। তার কথা চিন্তা করবার আমার সময় নেই। এবং দেখি বাবুই খুব শান্ত আত্মস্থ হয়ে গেছে। পড়াশোনাতে ডুবে থাকে একেবারে। এত মনোযোগ ওর কোনওদিন দেখিনি। ওর কম্পিউটার খালি

চ্যাট করে যায়, চ্যাট করে যায়। —কার সঙ্গে অতক্ষণ চ্যাট করছিস রে? —নিক, নিকের সঙ্গে মা। ই-মেল আসে যায় প্রতিদিন, —কার মেল রে? —নিকের মা, সব কিছু তো চ্যাটে হয় না। ও লম্বা লম্বা মেলে আমায় অনেক কিছু জানায়। কী পড়ব, কীভাবে বুঝব কোনটা আমার নিজস্ব বিষয়। —এখনও বুঝতে পারিসনি? —না মা, এখনও আমি দ্বিধায় আছি, কোনটা কতটা পারব তা নিয়ে সংশয় আমার এখনও যাচ্ছে না। আশা করছি আর বছর দুয়েকের মধ্যে বুঝে যাব। তুমি ভেবো না মা।

সারাদিন লাইব্রেরিতে কিংবা ফিল্ড ওয়ার্কে কাটিয়ে বাড়ি ফিরলে আজকাল দেখি সেই বাবার আরামকেদারায় বসে পড়েছি আমার অভ্যাসমতো, যেন একটা বাক্য, বেশ লম্বা যৌগিক বাক্য এবার শেষ হল। দাঁড়ি পড়ল একটা। বসে পড়ে তখন চট করে আর উঠতে চাই না আমি। ওই ফুল স্টপটার স্বাদ নিয়ে তবে যেন অন্য প্যারাগ্রাফে যেতে হবে আমায়। দেখি সামনে রূপ নিচ্ছে একটা ধূমায়িত চায়ের পট। ট্রেতে পাশে কাপ-প্লেট, চিনিদান, দুটো দু রকম বিস্কিটের ছোট কৌটো। বাবুই আমার জন্যে করে এনেছে। এইটুকুর দরকার ছিল।

—কোথা থেকে শিখলি রে? রাত্রে খেতে বসে হালকা গলায় জিগগেস করি।

ও বলল— এ ভাবেই তো দিতে হয়। তুমিই তো করো মা, চিরকাল করেছ, ভুলে গেলে?

আমি বলি— কই, এত পরিপাটি করে কিছু করেছি বলে মনে করতে পারছি না তো রে?

—এমনি করেই করো মা, কিন্তু করো খুব তাড়াতাড়ি, ট্রটিং নয়, তোমার সব কাজকর্মে গ্যালপ গ্যালপ গ্যালপ। নিক করত খুব ধীরেসুস্থে, হাঁকডাক না করে,

—তাই বল, নিকের কাছ থেকে শিখেছিস।

—শিখেছি তোমার কাছ থেকেই, নিক বোধ হয় মনে করিয়ে দিয়েছে।

একদিন হঠাৎ ওইরকম করেই খেয়াল হল আরে, আমরা একসঙ্গে খাচ্ছি রাত্তির বেলায়, অনেক দিনই আমাদের অতিথি থাকছে সুদেবদা বা রত্ন। টুকাই বা

চয়ন। যেদিন আমার খেয়াল থাকে না, কম্পিউটার থেকে উঠছিই না, দরকারি কাজ, শেষ করতে হবে, তা ছাড়া চিন্তার সূত্রটা ছিঁড়ে যেতে দিতে চাই না, মজে আছি, দেখি পাশের টেবিলে সুপ আর স্যান্ডুইচ হাজির করেছে বাবুই। ও জানে খুব কাজের সময়ে আমি এমনি খেতেই পছন্দ করি। ও নিজেও তাই। ওর পরীক্ষার খুব সিরিয়াস পড়ার মাঝখানে আমি এভাবেই ওকে খাইয়েছি। ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেইটা করছে আমার জন্যে।

—মা, কবিতাদি খুব সুন্দর মৌরলা মাছের বাটি চচ্চড়ি করে গেছে, তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি, কাল খেও।

একেক সময়ে আমার মনে হয় আমি অলস হয়ে যাব না তো? তার চেয়েও বেশি আমি যদি নির্ভরশীল হয়ে যাই? আমি চিরকাল নিজের কাজ নিজের হাতে করেছি, আমি শ্রমিক। একেবারে মার্কসীয় আদর্শে আমি নিজের অর্জন করা অন্ন খাই। ধানটা, সবজিগুলো ফলাই না এইমাত্র।

একদিন, বাবুইকে বললুম কথাটা। —কী রে? আমি যদি বসে যাই?

—মানে?

—না, তুই যে হারে আমার দেখাশোনা করছিস যেন বা আমি বুড়োই হয়ে গেছি। এর পর তুই কোথায় থাকিস না থাকিস, আমি হয়তো তখনও সেবা প্রত্যাশা করে যাব। পাব না। আমার শান্তি যাবে, কাজ নষ্ট হতে থাকবে।

ও খুব নিশ্চিন্তে বলল— তোমার বড্ড কুসংস্কার মা! কী হাতি ঘোড়ার সেবা! যে কজন একসঙ্গে থাকে, তাদের কাজকর্ম ভাগ করে নিতে হয়। এর মধ্যে এত কিছু দেখছ কেন? এত দিন নাবালক ছিলুম, শিখিনি, এখন বড় হয়ে যাচ্ছি, এখনও যদি না শিখি তাহলে আমার কপালে দুর্গতি লেখা আছে মা।

খুব মসৃণভাবে সংসারটা চলতে থাকে। আমাকে যে সর্বক্ষণ একপায়ে খাড়া থাকতে হত, সেটা বদলে যেতে থাকে। আমি বুঝতে পারি এটার মধ্যে আমার একটা লুকোনো অহংকার, অধিকারবোধ, এবং আত্মপ্রসাদ ছিল। সেইটা ঘুচছে বলেই আমার যত অস্বস্তি। শাশুড়িরা বাড়িতে করিৎকর্মা পুত্রবধূ এলে এই রকম অনিরাপত্তাবোধে ভুগে নানারকম কেলেঙ্কারি করে থাকেন। আমার সংসার, আমার চাবি, আমার নিয়মকানুন। আমার পুত্রের কাজকর্ম আমাকে

এই শিক্ষা দিল। মনে মনে হেসে ভাবলুম, ভাবী শাশুড়িদের একটা ওয়ার্কশপ করলে হয়। পাত্র-পাত্রী যেমন বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করাবে, তেমনি তাদের এবং তাদের বাবা-মাদেরও রীতিমতো কাউনসেলিং হবে।

মজার ব্যাপার হল এই নিয়ে আমি একটা নকশা লিখে ফেললুম। সেটা পাবলিক খুব খেল, আরও অনুরূপ নকশা আমাকে লিখতে বলা হল, আমি বিদ্রোহ করলুম। আমি একজন স্বাধীন লেখক, যা নিজের ভাবনায় আসবে, ভালো লাগবে, তা অবশ্যই লিখব, কিন্তু আমাকে দিয়ে অর্ডারি মাল বার হবে না। সুদেবদা তর্ক করেছিলেন, অন্য লেখাগুলোর মধ্যেও তো অর্ডার ছিল। আমি যুক্তি দিলুম— ছিল, কিন্তু সেটা আমার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হয়েছিল, উপরন্তু জিনিসটা আমার ভালো লেগেছিল। এটা একটা হঠাৎ পাওয়া বিষয়। আবার যখন আসবে নিশ্চয় লিখব, কিন্তু জবরদস্তি চলবে না।

আমাদের মধ্যে এইসব চলছে, ইতিমধ্যে ওই নকশাটা নিয়ে একটা পুরোদস্তুর ফিল্‌ম হয়ে গেল। একদিন ফুলের কাছ থেকে একটা বিষণ্ণ ফোন পেয়ে খুব অবাক হয়ে গেলুম।—

—আমি তোর ফুলদি বলছি খুকু, ভুলেও তো দিদিটাকে স্মরণ করিস না, আচ্ছা খুকু, একেই আমার বউটার বদনাম। এখন আবার তাকে সিনেমায় নামাচ্ছিস?

—সিনেমায় নামাচ্ছি আমি, কাকে? কার বউ? কী বলছ?

—জারিন, জারিন, যে তোর লেখা বইয়ের মুখ্য ভূমিকায় নামছে, তুই-ই তো সে সব ব্যবস্থা করেছিস! আমি তোর কী করেছি রে খুকু যে এমন শত্রুতা করে চলেছিস।

আমার হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল, এ তো উলটো চাপ!

আমি বললুম— ফুলদি, আমি সেই খুকু যাকে তোরা বাড়ি থেকে এক রকম বার করে দিয়েছিলি, তার ভালোমন্দের খোঁজ রাখিসনি। জোর জবরদস্তির বিয়েটিয়ের কথাগুলো আর না-ই তুললুম। নিজেরাই একটা ট্যালেন্টেড মেয়েকে বদনাম দিয়ে বাধ্য করছিস নিজের ট্যালেন্ট ভাঙিয়ে কিছু

সাশ্রয় করার, আর জীবনে কখনও খোঁজ নিস না আমি আছি না নেই। এখন এই কথা নিয়ে আমাকে ফোন করতে তোর একটু লজ্জাও হল না? তুই তো অন্তত একটু আলাদা ছিলি বলেই আমার ধারণা! আমার লেখা নিয়ে ছবি হচ্ছে এইটুকু আমি জানি, সই করে দিয়েছি। তারপর তারা সেটা নিয়ে কী করছে না করছে আমার আর জানবার কথা নয়। জিগগেস করলি আবার এইরকম তেরিয়া হয়ে, এই একবারই তাই উত্তরটা দিলুম, পরের বার আর দেব না। এই প্রথম জানলুম জারিনা ওখানে অভিনয় করছে। জেনে আমি খুব খুশি। যদি ব্যাপারটায় আমার সত্যিই কোনও হাত থাকত, তাহলে আরও খুশি হতাম। আর শোন ফুলদি পৃথিবীর সব্বাইকে তোদের ধ্যান ধারণার খাঁচায় ফেলে মাপসই করে ছেঁটেকেটে ফেলবার অভ্যাসটা এইবেলা ত্যাগ কর। তুই বলে বললুম। অন্য কোনও দাদা-দিদি হলে বলতুম না।

ফুলদি ক্ষীণ গলায় বলল— মেয়েটা ভালো বলছিস?

—কী করে বলব? একদিন মাত্র দেখেছি, কথা বলেছি। ট্যালেন্টেড এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভালো কি না জানব কী করে? তা ছাড়া, ভালো বলতে তোরা যা বুঝিস আমি তা বুঝি না। ছাড়ছি।

—না না শোন শোন, খুকু, ভালো বলতে তুই কী বুঝিস?

—এক কথায় তো বলা শক্ত। শুনে কীই বা করবি?

—ওর চরিত্র, মানে পাঁচ জনের সঙ্গে... মানে কোনও স্ক্যান্ডাল?

—আমার চরিত্র সম্বন্ধে তোর কী ধারণা?

—তুই জেদি কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট ভালো। এই তো ছেলে মানুষ করছিস, অভিনয় তুইও করতে পারতিস, তা না করে ভদ্র উপায়ে আর্ন করছিস। আর একটাও বিয়ে করলি না।

—পছন্দসই কাউকে পেলে করতুম না তোকে কে বললে? অভিনয়ে চান্স পেলে করতুম না তাই বা কে বললে?

ফুলদি এবার বললে —তুই ভীষণ অনেস্ট, বিবেক আছে, হেলপ চাইলে কাউকে ফেরাস না, সৎসাহস আছে— এ-এগুলো আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। সব্বাই বলছে— তুই নিজের নামে সব সম্পত্তি কিনে নিয়েছিস

আমাদের ওপর শোধ তুলতে। আমি বিশ্বাস করি না। তুই কোনও না কোনও উপায়ে ছেলেদুটোকে ঠিক পথে চালাবি— আমি জানি, এও জানি তুই কাউকে ঠকাবি না। খালি ওই বউটাই আমাকে ভাবালে। তুই যদি সার্টিফাই করিস যে ওর চরিত্র ভালো আমার আর কোনও..

আমি হঠাৎ দুম করে বলে বসলুম— ফুলদি মহর্ষির মানে আমাদের বাবার চরিত্র ভালো ছিল?

ও দিকটা চুপ।

আমি বলি— ময়না কে? কেন থাকত আমাদের বাড়ি? বাবার ব্যক্তিগত কাজ করার জন্য পুরুষ পাওয়া যেত না?

ও দিক চুপ।

—হ্যাঁ, কোনও স্ক্যান্ডাল ছিল না। কারণ তাঁর টাকা ও প্রতিপত্তি ছিল। তাই তো?

ও দিকে ভীত স্তব্ধতা।

আমি তখনও ছাড়ি না, বলি—আমাদের মা যিনি আজীবন ছেলের বয়সিদের কাছেও সুহাসদি বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁর চরিত্র নিয়ে বদনাম রটলে কিছু বলবার থাকত? সব সময়েই তো এক দঙ্গল পুরুষমানুষ নিয়ে ঘুরতেন। রটেনি ধূর্ত ছিলেন বলে, আর ওই প্রতিপত্তি ছিল বলে। তোদের বামনাই করার মুখ আছে বলে আমি মনে করি না।

ফুলদির গলা প্রায় শোনাই যাচ্ছে না, বলল—তুই কি এ সব রটাবি না কী?

—রটাতেই পারি, তোদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হবে না, তোদের দিকে লোকে আড় আড়ে তাকাবে। বিলদির আর তোর লাইফ হেল হয়ে যাবে। কম মজা!

—বলিস কী খুকু?

—তবু তো তোদের বেরোতে হয় না, করে খেতে হয় না ওই মেয়েটার মতো। আশা করি সিচুয়েশনটা বুঝতে পেরেছিস। এখন রাখছি।



তাহলে জারিনা শেষকালে সিনেমায় নামল? থিয়েটারের একটা আলাদা প্রেস্টিজ আছে। ওর নিকি বাইজি দেখে আমি তো মুগ্ধ। তারপরেও দেখেছি ওর গ্রামের মেয়ের রোল, দুটোতেই ও সমান স্বচ্ছন্দ, চেনা যায় না একই মেয়ে বলে। তা ছাড়া সবই এখন গ্রুপ থিয়েটার। কমার্শিয়াল নয়। আমি একটু আধটু করেছি। এইটুকু জানি পলিটিকস আছে ঠিকই, তবু শেখারও কিছু থাকে।

টাকা-পয়সা ভাঁড়ে মা ভবানী। আজকাল তাই এটাই রীতি হয়ে গেছে দেখছি। থিয়েটার থেকে সিরিয়াল, সিরিয়াল থেকে সিনেমা। তারপর প্রতিটি ডেইলি নিউজ পেপারে তোমার জন্য একটা পাতা থাকবে। তুমি কতটা কম জামাকাপড় পরতে পার, তোমার নাভি বোতামটি কেমন, তুমি কবে থেকে সচেতন হলে পুরুষরা তোমার দিকে তাকাচ্ছে, তোমার সেক্সিয়েস্ট অঙ্গ কোনটি। তুমি পুরুষের কী দেখে উত্তেজিত হও।

ভেতরটা আমার একটু কেমন কেমন করছে। জারিনাকে কি আমিই এ দিকে ঠেলে দিলুম? অন্তত পক্ষে চয়ন তো আমাকে দায়ী করতেই পারে! প্রত্যেক প্রোফেশনের একটা আলাদা বলয় আছে। স্বয়ংক্রিয়। একবার ঢুকলে ওই বৃত্তই তোমায় চালিয়ে নিয়ে যাবে। চাকার সঙ্গে ঘুরতে পার তো সব নিজত্ব বিসর্জন দিয়ে ঘুরতেই থাক ঘুরতেই থাক না হলে চাকা তার কেন্দ্রাতিগ শক্তি দিয়ে তোমায় ছুড়ে ফেলে দেবে। তুমি কোথায় পড়লে, গোটা রইলে কিনা সেটা নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

মাঝে মাঝে খোঁজ করছি শুধু দালালরা কেমন অফার আনছে। একটা বাগান বিক্রি হল। তারকেশ্বর শহরেই তিন তিনটে বাড়ি আমাদের। নিজেদের বসতটা ছাড়া। বসতটা বিরাট। দেড় বিঘের মতো হবে। সেটাতেই বেশি ঝোঁক ক্রেতাদের। বহুতল করা যাবে। অন্য বাড়িগুলো ছোট ছোট। আমি টুকাইকে বলি ভাড়া দেওয়া বাড়ি একটা খালি করিয়ে উঠে যাবার চেষ্টা কর। সে ক্ষেত্রে বড় বাড়িটা বিক্রি করা যাবে। টুকাই শিউরে উঠল। দাদুর বাড়ি...বিক্রি করে দেবে?

—তুই কতদিন ওর রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবি? যখন ভেঙে পড়বে, কিছুই দাম পাবি না। উপরন্তু বেহাত হয়ে যাবে। কথাটার যুক্তি আছে। অনেক গুঁইগাঁই করে টুকাই রাজি হল। তবে সময় লাগবে। ইতিমধ্যে মার সেবা করবে বলে যে নিয়ে গিয়েছিল সেই বিলদির নাকি হঠাৎ ইউরোপ বেড়াতে যাওয়া স্থির হয়েছে। তাই মাকে ও খড়দায় রেখে গেছে। সর্বনাশ! এইবার মায়ের কপালে সত্যি দুঃখ আছে।

আমার দ্বিতীয় নকশাটা হল এই নিয়েই। এক ধুরন্ধর ভদ্রলোক চিরকাল ছেলেমেয়েদের মধ্যে ডিভাইড অ্যান্ড রুল করে এসেছেন। এখন বৃদ্ধ বয়সে সম্পত্তির বেশিরভাগ অংশ একজনকে দেবেন লোভ দেখিয়ে চুটিয়ে সেবা খেয়ে নেন, তারপর আরেক জন তাঁকে হাতে পায়ে ধরে নিয়ে যায়। লেখাটা যাকে বলে ব্ল্যাক কমেডি। এটাও অভিনয় করার জন্য একটি থিয়েটার গ্রুপ নিয়ে গেল। শেষ সিনে লোকটির ঠ্যাং-এ দড়ি বেঁধে ডোমরা নিয়ে যাচ্ছে, স্টেজের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। এবং সামান্য যা বাকি আছে ভদ্রলোকের ঋণের জালে জড়িত, সেগুলোর দায় নিতে গেলে প্রত্যেকে বিপদে পড়ে যাবে। তাদের উত্তেজিত ভীত জটলা। এই দুটো ভাগে ওরা সিনটা ভাগ করেছে। ভালোই করেছে। নাটকের মধ্যে অনেক অংশ আছে যেখানে উচ্চকিত হাসির সুযোগ আছে। যদিও সেই হাসির মধ্যে শ্লেষ মিশ্রিত। সাধারণ দর্শক তো এই সূক্ষ্মতাগুলো জানে না। তারা হো হো করে হাসছে। কিন্তু শেষ দৃশ্যে তাদের একেবারে চুপ করিয়ে দিয়েছে নাটকগ্রুপটি। সব চুপ, যেন শ্মশানের স্তব্ধতা বিরাজ করছে। লোভ ও স্বার্থপরতা মানুষকে কোন অতলে নিয়ে যায়, দর্শক যদি কয়েক ঘণ্টার পরিসরেও তা উপলব্ধি করে

থাকে, তাহলে থিয়েটার গ্রুপটিকে আমি শাবাশ জানাব। শেষ দৃশ্যে যে কায়িক অভিনয় দেখিয়েছে ওরা, খানিকটা ট্যাবলো, খানিকটা ফ্রিজ করে, আমার তো খুব পছন্দ হল। নাটক যদি পরিমিত পরিমাণে নাটকীয় না হয়, সবটাই ন্যাচার‍্যালিস্টিক অভিনয় হয়, তাহলে সে কেন একটা আলাদা মিডিয়াম!

একধারে তারকেশ্বর আরেক দিকে নকশা নাটক ইত্যাদি নিয়ে আমি যখন ব্যস্ত, তখন একদিন বাড়ি ফিরে দেখলুম জারিনা বাবুইয়ের সঙ্গে দিব্যি বসে গল্প করছে। দু-জনের মাঝখানে কফির কাপ, চিঁড়ে ভাজা। তাতে বেশ বাদাম টাদাম দেওয়া।

--কী রে, তোরই তো দিনকাল, আমি হেসে বললুম।

—যতটা ভাবছ ততটা নয়।

বাবুই বলল—বেশি কথা বলবার আগে বসে পড়, পটে এখনও বোধহয় চা আছে।

বেশ নীল-নীল আকাশ, সাদা সাদা মেঘ, পুজো পুজো আলো। সারাদিনটাই আজ আবহাওয়ার গুণে ভালো কেটেছে। বিশেষ করে যখন বাড়ি ফিরছিলুম তখন যেন মনে হচ্ছিল মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাসরি। সত্যি বলছি যেন মনে হচ্ছিল উড়ে যাই। বাড়ি ফিরে দেখলুম দুটো ডানা টেবিলের দু দিকে। একমুখ হাসি নিয়ে জারিন কী বলছে, বাবুই শুনতে শুনতে মিটিমিটি হাসছে।

—তুই তো আমার ওপর রাগ করেছিস। আমি বললুম।

—করেছিলুম, মাসি। এখন আর রাগ নেই। বলে ও আমার দিকে চা এগিয়ে দিল।

রাগ করার কারণটা আমি জানি, কিন্তু রাগ গেল কেন তা তো জানি না! জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছি, কিন্তু ও আর কিছুই বলল না।

—চয়ন কোথায়? এল না!

—চয়ন কোথায়, চয়নই জানে। আমার ইচ্ছে হল চলে এলুম।

খেয়াল করে দেখি আজ ও একটা লম্বা স্কার্ট পরেছে, মেটে লাল রং, সাদার ওপর শকিং পিংক ফুল ফুল ছাপ একটা ঢোলামতো টপ। চুলটা খুব এলোমেলো, ফুটফুট করছে একেবারে, যেন স্কুলের মেয়ে। বাবুই এখন নতুন

বড় হচ্ছে, ঠোঁটের ওপরটা কালচে হতে শুরু করেছে, ঢ্যাঙঢ্যাঙে লম্বা। দুজনে যেন হাই স্কুলের বন্ধু। জারিনের আসার কোনও বিশেষ কারণ আছে কি না বুঝতে পারছি না। আর ও এত সহজভাবে আড্ডা মারছে যেন ও এখানে রোজ আসে।

আমি বললুম—হাত মুখ ধুয়ে আসি, তোরা গল্প কর।

—দেরি করো না, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

তাহলে ঠিকই ভেবেছি, কথা আছে? আর সত্যিই তো কথা না থাকলে হঠাৎ আসবে কেন?

আমি একেবারে গা-টা ধুয়ে গায়ে চন্দন গন্ধ ট্যালকাম ছড়িয়ে, ধোপদুরস্ত হয়ে এসে বসি।—বল কী বলবি! সঙ্গে সঙ্গে বাবুই উঠে দাঁড়ায়—আমি চললুম, তোমরা কথা বল।

আমার দিকে তাকিয়ে ঝকঝকে হাসল মেয়েটা। একটা হাসি দেখেই আমি বুঝে গেলাম এ মেয়ে আর কাউকে দেখে, বা নিজের সমবয়সিদের আদলে নিজেকে তৈরি করেনি। কাজটা কঠিন। যারা পারে, তারা কষ্ট পায়, নানারকম ঠাট্টা তামাশার শিকার হয়, ফলে অনেক সময়ে বিষাদে ভোগে, একলা একলা থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, এমন হাসি টিকিয়ে রাখতে পারে না। এটার জন্যে মনের জোর চাই।

ও বলল—সেদিন তুমি দুটো কথা বলেছিলে, দুটোই আমায় খুব ভাবায়।

ও নিজের আঙুলগুলো দেখতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। যেন ভাবছে কীভাবে বলবে। আমি ওকে ভাবতে দিই।

—তুমি বলেছিলে লোভ জিনিসটা ভালো নয়। রাজেশ্বরী মাসি কথাটা কিছু নতুন না। কিন্তু তুমি যখন বললে যেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বললে। ভালো নয়, শুধু তাই নয়, বলেছিলে, লোভ তুমি বরদাস্ত করতে পার না। লোভ ঠিক কী? মাসি!

—ওরে বাবা, তুই যে আমাকে একেবারে ফিলসফিক্যাল ডিসকোর্সের মধ্যে ফেলে দিলি রে!

—আমার প্রশ্নটা আরেকটু পরিষ্কার করি। ধরো চয়নের কিছু টাকা-পয়সা পাওয়ার যোগ হয়েছে, আর সেই বিষয়ে কথা বলতে আমিও ওর সঙ্গে তোমার কাছে এসেছি। ব্যাপারটা ভাবলে আমি সত্যিই নিজেকে নিজে বরদাস্ত

করতে পারছি না। কী ভীষণ লজ্জাকর! আচ্ছা আমার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু চয়ন যে নিজের আর্ন না করা টাকা-পয়সা জাস্ট দিদাই হাত তুলে দিচ্ছেন বলে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল, এটাও তো কম লজ্জাকর নয়! যদি উত্তরাধিকারের কথাই ধর, সেটা তো ওর মায়ের। ও কেন তার জন্যে অমন লুব্ধ হবে? তোমার কাছে দরবার করতে আসবে? আমরা একটু ছোটরা এগুলো খুব খুঁটিয়ে ভাবি না বলে যা যা ঘটে সেই সেই মতো চলি, ফাঁদে পড়ে যাই।

আমি তাড়াতাড়ি বলি—জারিন, তুই একেবারে একটা তিলকে তাল করছিস। উত্তরাধিকার যার কাছে যায় সে-ই উত্তরাধিকারী। আর চয়ন তো খারাপ কিছু করেনি, বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে বেচারি বেকায়দায় পড়ে গেছে। ও তো চেষ্টার কসুর কিছু করেনি। আমি এমন অনেক লোককে জানি যারা বাবার টাকা পাবে বলে নিজেরা অলস হয়ে বসে থাকে। চয়ন তেমন নয়। তুই চয়নের বউ, সঙ্গে এসেছিস, ব্যস আর তো কিছু করিসনি। ওকে একটু হয় তো জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেছিলি। এমন কিছু খারাপ হয়ে যাসনি তাতে। ছাড় ও সব। আসলে পড়ে পাওয়া জিনিস অনেক সময়ে মানুষের মেরুদণ্ড নষ্ট করে দেয়। সেটা থেকে সাবধান থাকতে হয়।

জারিন মাথার চুলগুলো দুহাতে জড়িয়ে একটা গুটকি মতো খোঁপা বেঁধে নিল, তারপর বলল—ঠিক আছে। কিন্তু নিজের আর্ন করার জায়গায়ও কি লোভ নেই?

--মানে? তুই কি ঘুষ টুস নেওয়ার কথা বলছিস?

ও হেসে ফেলল।—না। এই ধরো আমি থিয়েটারে ছিলাম। কাজ করে আনন্দও পাচ্ছিলাম। কিন্তু আনন্দে পেট ভরে না। যখন তুমি ওই লোভের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলে তখন আমি ভাবতে শুরু করলাম—নিজে রোজগার করব। সুখে থাকার মতো রোজগার। ফিল্মের অফারটা এল নিয়ে নিলাম। আরও আসছে। দু তিনটে অলরেডি নিয়ে নিয়েছি, তারপর প্রশ্নটা আমাকে জ্বালাচ্ছে। এটাও তো লোভ? যদি আমার মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে দেয়?

আমি কি বলব? আচ্ছা মেয়ে তো? যার মনে এত প্রশ্ন, সে কি কখনও ভুল পথে যায়? সাবধানে ভেবেচিন্তে কথা বলতে হবে।

জিজ্ঞেস করলাম—ভালো লাগছে?

—থিয়েটারের মতো না। কিন্তু মজা আছে, চ্যালেঞ্জও আছে।

—তুই যদি রোলটা তোর পছন্দসই কিনা দেখে কাজগুলো নিস, জাস্ট টাকার জন্যেই কাজটা না করিস, তা হলেই তো হয়!

ও চুপ করে রইল, একটু পরে বলল—তাই-ই করব। কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আমাকে এক রকম বলল, পরে করতে গিয়ে দেখলাম অন্য কিছু কিছু এলিমেন্ট আছে, যেগুলো আমার পছন্দ নয়। বলেনি আগে। আমি নতুন এসেছি, প্রথম থেকেই যদি এত মেজাজি হই কাজ পাব না।

—অনেস্ট কমপ্রোমাইজ কর। আর সচেতন থাক, তাহলে ফাঁদগুলো এড়াতে পারবি।

—বলছ?

—বলছি। আর স্টার যতদিন না হচ্ছিস, টাকা জমিয়ে যা, ইনভেস্ট করে যা। লাইফ-স্টাইলে ব্যাপক চেঞ্জ করিসনি।

—কেউ নেই মাসি যার সঙ্গে একটু পরামর্শ করি। একটু যেন নিশ্চিন্ত লাগছে এখন।

আমি সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করি—তোর মা, বাবা, বা আর কেউ?

—আমার শুধু বাবা ছিল। মা মারা গেছেন, এমনই শুনতাম বাবার কাছ থেকে, এখন মনে হয়, না, বোধ হয় কোনও মিস্ট্রি আছে। আর বাবা একজন মাতাল জুয়াড়ি ছিল, যতদিন বেঁচে ছিল আমায় পাগল করে দিয়েছে। ভাগ্যিস, স্কুলে পড়তে পড়তেই অভিনয় শিখতে আর করতে শুরু করি। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি তখন বাবা মারা গেল। ব্যাস, পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল। খুব যে ভালো লাগত তাও নয় অবশ্য। ও লাজুক হাসল।

তারপর বলল—আরেকটা প্রশ্ন করেছিলে। সেইটা কেন, একটু বলবে!

—কী আবার বেফাঁস বললুম?

—বেফাঁস বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে দুটো বিয়ে আর ডিভোর্সের পরেও কেন আবার বিয়ে করলাম। বলোনি!

—বলে থাকলে ক্ষমা চাইছি তোর কাছে।

—উঁহু, ঠিকই বলেছিলে। মাসি, চয়নকে আমার আর ভালো লাগছে না। ওকেও...

আমি চমকে উঠেছি—সে কী? কেন?

—কেন ঠিকঠাক বলতে পারব না। ধরো আমি এখন নাটকও করি, ফিল্মও করি। একদম সময় নেই। আর ওর অনন্ত সময়। ও বোর হচ্ছে, রেগে যাচ্ছে, অভিমান-টানও হচ্ছে বেশ। এত রকম ইমোশন আমি ট্যাকল করতে পারছি না। আর আমি কাজে ব্যস্ত বলে ও যে সাংসারিক কাজগুলো করবে, বা করিয়ে রাখবে, সে ইচ্ছেও ওর নেই। এগুলো সব আমার চেনা সিমটম মাসি। আমি ভয় পাচ্ছি। বেশি বিটারনেস আসার আগেই দূরে সরে যাওয়া ভালো।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলুম। ইস, এত চমৎকার মেয়েটাকে চয়ন ধরে রাখতে পারল না?

—তুই কি একটু বেশি অধৈর্য হচ্ছিস না? কত টানাপোড়েন চলে, চলবে, তবে তো সম্পর্ক পাকা হবে। ওর একটু কিনারা হয়ে গেলেই দেখবি ব্যস্ত হয়ে যাবে। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া ভালো না। জীবনে একজন সঙ্গী লাগে। আর এমন কোনও দম্পতি নেই যারা চিরকাল একরকম সুখী থেকেছে। এই সব ওঠাপড়াকেও মেনে নিতে হয়।

—বলছ?

—হ্যাঁ, বলছি।

—তোমার অভিজ্ঞতা কি আমাব চেয়েও খারাপ?

—অনেক অনেক। চয়ন তো একটা স্বাভাবিক ছেলে। একটু হয়তো ছেলেমানুষ। কিছুটা সময় লাগবে।

—সর্বক্ষণ বন্ধুর মতো থাকবে, সব কাজকর্ম দুজনে মিলে মজা করে করব, রাগ নেই, ভয় নেই, হিংসা নেই, এমন হয় না, মাসি?

—বলছিস জীবনটা একটা প্রলম্বিত আড্ডা, একটা প্রলম্বিত পিকনিক হওয়া দরকার? না হলেই বিচ্ছেদ?

—সেইরকম শোনাচ্ছে আমার কথাগুলো, না?—জারিন হেসে ফেলল। হাসির মধ্যে সামান্য একটু ছায়াপাত ঘটেছে। চাঁদে সবে গ্রহণ লাগছে। এই

গ্রহণ সম্পূর্ণ হবে, না হবে না? চারদিক বড্ড চুপচাপ। ও ভাবছে। আমার কথায় ওর মনে নিশ্চয় তরঙ্গ উঠেছে। ও একেবারে ঠিক কী ভাবছে বলতে পারব না। কিন্তু আমি যা ভাবছি, সেটা একটু অন্যরকম, আমার স্বাভাবিক ভাবনা নয়, আরও অনেক সতর্ক, একপক্ষের প্রতি সংবেদনশীল। আমি ভাবছি কী করে চয়নের জন্যে জারিনকে ধরে রাখা যায়। আমার খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা হয়ে গেছে চয়ন খুব সাধারণ ছেলে, এবং জারিন ট্যালেন্টেড মেয়ে তো বটেই। মনোবৃত্তির দিক থেকেও সাধারণ নয়। কতদিন এই অসাধারণত্ব ধরে রাখতে পারবে জানি না। প্রত্যেক পেশারই কতকগুলো নিজস্ব ধর্ম আছে। জারিন কতদিন সেগুলো এড়িয়ে নিজেকে আলাদা রাখতে পারবে? ও হয়তো অনেক দূর যাবে, নাম-যশ, টাকা-পয়সায়। চয়ন যদি টাকা-পয়সার দিক থেকে স্বয়ম্ভর হয়ও, নাম যশে হতে পারবে না, তখন? সেই চিরপরিচিত কমপ্লেক্স কাজ করবে, দুজনের জীবনই নরক হয়ে যাবে। সাধারণ নিয়ম অন্তত তাই বলে। তার থেকে আলাদা কিছু হতে পারে না, এ কথা বলছি না। কিন্তু সাধারণত হতে দেখিনি।

জারিন হঠাৎ একটু মাথা ঝাড়া দিল, ওর বাঁধা চুল ছড়িয়ে পড়ল আবার। বলল—ঠিক আছে। কিন্তু তোমার একটু ব্যাপারটায় ঢোকা দরকার।

—কী ভাবে? —আমি বলি—স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে দ্বিতীয় কারও কথা বলা কি ঠিক?

—ওর তোমার ওপর দারুণ আস্থা, মাসি। বরং, কিছু মনে করো না, টুকাইদার ততটা নেই। টুকাইদা খুব ওয়ারিড। ফৌজদারি মামলা শিওর ছিল, সে ক্ষেত্রে শুধু জেল নয়, ওর চাকরিও চলে যেত, তাই এমন করে তোমার ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু যেই বিক্রি হওয়া সম্পত্তিগুলো তোমার নামে মিউটেশন হয়ে যাচ্ছে, ও মাথা চাপড়াচ্ছে।

খবরটা আমার কাছে একটা শক-এর মতো এল। একটু সামলে নিয়ে বললুম—আস্থা না থাকলে আমার করার কিছু নেই জারিন, ওই যে বলেছিলুম লোভ জিনিসটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। ওটাই আমার অ্যাটিচুড। ভালো করে বুঝে নে ব্যাপারটা।

ও বলল—আমি বুঝেছি। চয়নও ঠিক আছে। টুকাইদাই একটু...।

—ঠিক আছে। ও প্রসঙ্গ এখন থাক। তোর মনস্থির করার ব্যাপারে আমি

কী করতে পারি বল।

—কিছু নয়। আরেকদিন চয়নকে নিয়ে তোমার কাছে আসি। এমনি। সেদিন একটু ব্যক্তিগত কথার মধ্যে ধীরে ধীরে চলে যাব।

জমি-জমা বিক্রি যে জটিল ব্যাপার আমার ধারণা ছিল। যদি একাধিক দাবিদার থাকে তাহলে তো সবই সাত বাঁও জলে। এখন সেই সমস্যাটা থাকছে না। টুকাইদের নামে কেস ঠুকে দিতে গিয়ে ওরা দেখে টুকাই চয়ন সব আমাকে আগেই বেচে দিয়েছে। বিলদি আমাকে যাচ্ছেতাই করল ফোনে। লালদা বলল—তুই একবারও এই সবচেয়ে বড় দাদাটার কথা ভাবলি না? খুকু স্বীকার করছি তোর বিপদে হয়তো পাশে দাঁড়াতে পারিনি তেমন করে, কোমরের জোর কতটুকু ছিল বল! তাই বলে তুই এমনভাবে শোধ নিবি?

—এত ভেব না—আমি গম্ভীর গলায় বললুম—আমার বিপদে না হয় দূরে সরেছিলে, কিন্তু নিজের ভাগনেদের তো জেলে পোরবার কথা ভেবেছিলে? সেটা এই বয়সে কী করে করলে? তার ফলাফল একটু তো ভোগ করতে হবেই। মা কেমন আছে? লালদা বলল—উনিই তো যত নষ্টের গোড়া। এখানে আর থাকতে পারলেন না, দোলন নিয়ে গেছে চা-বাগানে। ওর ছোট মেয়ের বিয়ে।

—তোমরা যাবে না?

—কে আবার প্লেন ফেয়ার দিয়ে যায়। পারব না। তুই নেমন্তন্ন পাসনি?

—না। মা এলে আমাব কাছে পাঠিয়ে দিও।

লালদা তো-তো করে চুপ করে গেল। অর্থাৎ হয় ওর সাধ্য নেই, নয় ও পাঠাবে না, দু ক্ষেত্রেই অন্দরের কথা ওকে শুনে চলতে হয়।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, জিগগেস করি—নীলদা কী বলছে? নীলদার কী খবর?

—নীল? খ্যাঁক করে উঠলো লালদা—ও তো শুধু পাগল নয়, শেয়ানা পাগল একটা। বলবে আবার কী! উনি নাকি সবেতেই মজা পাচ্ছেন।

—বলেছে কথাটা! মজা পাচ্ছে?

—বলতে হবে কেন? আমরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? ঠোঁটের কোণে সব সময়ে একটা বাঁকা হাসি। উনি হলেন গিয়ে মহাপুরুষ, আমরা এলেবেলে,

বিষয় বিষয় করে মরছি তো!

আমার মনে পড়ে যায় এক সময়ে ওরা অবিচ্ছেদ্য ছিল। জোড়া রাজপুত্তুর।

—কোথায় এখন ও? জানতে চাই।

—কী করে জানব? পায়ে তো সরষে! হিমালয়-টয়ের দিকে গেছে বোধহয়। সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ তো! আমাদের মতো পাপী তাপী নয়।

—নীলদা চাকরি করে না? জি এম না কি হয়েছিল যেন?

—পাগল তো! ছেড়ে দিয়েছে। সি ই ও অব্দি হয়ে যেতে পারতো টিকে থাকলে। ছেড়ে দিয়ে এখন দাড়ি পরে সাধুগিরি হচ্ছে। যাক রাখি।

নীলদার পরিবর্তনটা আমায় ভাবায়। আমি যতদিন দেখেছি ও প্রাণপণে কেরিয়ার করছে। আর এখন সেই ছেলে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে...যাক, এই গোস্বামীরা কখন কে কী করে, ভেবে বোধহয় আমি কূল পাব না। হঠাৎ খচ করে একটা কথা মনে হলো। সুহাসিনী যেমন একটা উত্তরহীন অঙ্ক, নীলমাধবও তাই। ওর কী কেন আমি খুঁজে পাচ্ছি না।



অতএব এখন আমি সমালোচনা শিল্পে হাত দিয়েছি। সুদেবদার পরামর্শমতো। বেশ কিছু টাইমস লিটার‍্যারি সাপ্লিমেন্ট জড়ো হয়েছে। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু পড়ছি। ওদিকে টি এস এলিয়ট, আই এ রিচার্ডস। শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন পড়ছি। পড়তে পড়তে যেন নতুন একটা দিগন্ত খুলে যাচ্ছে আমার সামনে। একটা সংরক্ষিত অরণ্যে ঢুকছি। আপাতভাবে এ জঙ্গল। কিন্তু জঙ্গলের বিশৃঙ্খলা এখানে নেই। প্রত্যেকটি গাছ এখানে যত্নের চিহ্ন সর্বাঙ্গে মেখে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও হাতি এই কমলবনে ঢুকতে পারবে না। ভার্জিনিয়া উলফ, গ্রাহাম গ্রিন হাতে এল। সুদেবদা আর রত্ন মিলে যা পাচ্ছে আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। পড়তে পড়তে এক সময়ে পাতা ওলটাই। ফাঁকা পাতা, আমার নিজস্ব পাতা। দু-এক লাইন লিখি। তারপর এক সময়ে পৃথিবী ভুলে যাই। ভেতর থেকে অন্য গদ্য অন্য ছন্দ বেরোতে থাকে। 'রান্নাঘর'-এর বিপুল জনপ্রিয়তা, তার হিসেবপত্তর আমাকে বিরক্ত করতে থাকে। টুকাইয়ের মিসড কল পেয়ে আমি জবাবি ফোন করি না। দরকার জরুরি হলে ও আবার ফোন করবে। রত্নর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মশগুল হয়ে যাই। চারপাশের বাস্তব পৃথিবীটা কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যায়। আমি বিচরণ করতে থাকি মানুষের সৃষ্ট পৃথিবীতে. বাস্তবের ওপর ভিত তবু অবিকল বাস্তব নয় যা। এবং নিকের সঙ্গে আমার ই-করেসপন্ডেনস হয়ে

ওঠে তুমুল। প্রতিদিন চলছে, প্রতিদিন বদলাচ্ছে, আরও শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে যাচ্ছে আমার ভাবনা-চিন্তার। আমাকে কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকে কে!

—কে রে? দূরের চোখ কাছে এনে আবছাভাবে বলি। আবছাভাবে দেখি একটা মুখ ভেসে উঠছে, চেনা-চেনা লাগে যেন?

—মাসি! মাসি! ও হো, এ তো চয়ন, চয়নের পেছনে টুকাই, তার পেছনে জারিন।

—মাসি একটা খবর আছে।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি।

টুকাই বলল—সাহেব ভটচায মারা গেছে। বাবুই কই? বাবুইকে তো যেতে হবে?

—কেন? আমি বোকার মতো বলি।

—কী আশ্চর্য! ছেলে না? মুখাগ্নি করবে না?

আমি আবার অসহায়ের মতো বলি--আর কেউ নেই?

—তুমি যে কী মাসি! ছেলে থাকতে আবার কে মুখে আগুন দেবে! বাবুই কই?

তারপরের ঘটনাগুলো ঘটল স্বপ্নের মতো। বাবুইয়ের নম্বর দিলুম, ওর সম্প্রতি হয়েছে একটা সেলফোন। ওরা ফোনে খবরটা ওকে দিল, ও বোধহয় কাছাকাছিই ছিল। এসে গেল, টুকাই আর চয়ন ওকে প্রায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। একটা ঝোলার মধ্যে কী কতকগুলো জামাকাপড় পুরে নিল বাবুই। মা আসছি বলে বেরিয়ে গেল। যাবে কিনা, আমার মত কী, মনোভাব কী, এ সব জিগগেসও করল না। দেখলুম তিন মূর্তি বেরিয়ে গেল। এক মূর্তি রয়ে গেল। কে রইল?

জারিন বলল—আমি আজ তোমার কাছে থাকব মাসি? থাকি, হ্যাঁ?

আমি কলের পুতুলের মতো ঘাড় নাড়লুম, তারপর বললুম—কেন? কোনও বিশেষ কারণ আছে?

—না না, তেমন কিছু নেই। এমনি।

বইপত্রগুলো তুলে রাখি। কেউ কাছাকাছি ঘুরঘুর করলে আমি কিছুতেই মন দিতে পারি না। আমার ভেতরের জগৎ থেকে দুম করে কে আমাকে বাইরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। এতটাই দূর? এতটা? আমি কথা বলতে পারছি

না, সেই শকে। কী রে বাবা? তাহলে, মানুষের কাছে দু দুটো জগৎ আছে? এটাকেই কি ফোর্থ ডাইমেনশন বলে? আমি তো একেবারে এখানে ছিলুম না! ধাক্কা দিয়ে বার করল ওরা আমাকে। সেই এইচ জি ওয়েলস-এর গল্পের মতো। স্কুলের সায়েন্স টিচার কী একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন, দুম করে একটা বিস্ফোরণ হল তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁকে আশপাশে টের পাওয়া যায়, কিন্তু দেখতে শুনতে পাওয়া যায় না। একদিন, স্কুলের বাগানে ফুলের ঝোপের পাশে হঠাৎ তিনি আবার আবির্ভূত হলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা বললেন ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মানুষটি। তিনি এক ছায়াময় জগৎ দেখে এসেছেন। এই জগতের সমলয়েই তার অবস্থান। এই সব বাড়িঘর রাস্তা, মানুষ বাগানের ওপরেই বিছিয়ে রয়েছে অন্য জগৎ। দুটো কখনও কখনও একই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। আমি সেই বাস্তব জগৎ থেকে ছায়াময় জগতে চলে এসেছি, নাকি উলটোটা? আপাতত আমার ভ্যাবাচ্যাকা দশা। জারিন আর সরস্বতী কুণ্ডি আমি একটার ওপর আরেকটা সুপারিমপোজ করা ছবির মতো দেখতে পাচ্ছি। সরস্বতী কুণ্ডি ফেড আউট করে যায় খুব আস্তে আস্তে, আমি আমার ঘোড়ায় চেপে ধীরে ধীরে বার হয়ে আসতে থাকি। স্পষ্ট হয়ে আসতে থাকে জারিন, জাম রঙের কামিজ কানে একফোঁটা মুক্তো দুলছে। এ-ই হল তাহলে সাহিত্যের আসল ধর্ম, বা কেরামতি! সে একটা পুরো জগৎ তৈরি করে ফেলে? এই পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গেই সে একীভূত অথচ আলাদা হয়ে ঘুরছে। ঘুরছে ভু-সমলয় কক্ষেই, তার চলনের ফ্রিকোয়েন্সিটা আলাদা। এই! এই ভাবে সাহিত্যকে বুঝে আমি স্তব্ধ হয়ে আছি, জারিন খুব সন্তর্পণে বলল---মাসি, আমি তোমাকে এত বিচলিত কখনও দেখিনি, দেখব ভাবিওনি। তুমি কি কিছু মনে করবে যদি আমি তোমায় জিগগেস করি---এই সাহেব ভট্টাচার্য তোমার হৃদয়ের ঠিক কোন জায়গায় ছিলেন, যে তুমি আজ এমন করছ?

--হৃদয়টা ঠিক কোন জায়গায় থাকে জারিন? আমি জিগগেস করি, আমার গলায় এখনও সেই সুদূর।

ও বুকের বাঁ দিকে হাত রেখে বলল—এইখানেই তো জানি।

—ওখানে কোনও সাহেব নেই।

ও মাথায় টোকা দিয়ে বলল—অবশ্য আজকাল বিজ্ঞান বলছে সবটাই

মগজে।

—ওখানেও না।

—তাহলে?

—কোথাও কোনও সাহেব নেই আমার চেতনায়। আছি কোন সুদূর অতীতে, সে অতীতটাও আমার কাছে ছেলেবেলায় পড়া বাজে ভয়ের গল্পের মতো হয়ে গেছে, কেউ মনে করিয়ে দিলে মনে পড়ে, ওই একটা বাজে গল্পের মতো। অনেকটা জীবন পেরিয়ে এসেছি। এখন হাসি পায়।

জারিনের কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে বুঝতে পারি, ও বলে—তাহলে এত বিচলিত হলে কেন ওঁর মৃত্যুর খবর শুনে? নাকি বাবুইকে যেতে হচ্ছে বলে তোমার খারাপ লেগেছে? তোমার একদম মত ছিল না, না?

—ওর তো আঠারো বছর বয়স হল, ও তো কতকগুলো জরুরি সিদ্ধান্ত নিতেই পারে!

—তোমার পছন্দ হয়নি এটা তো সত্যি?

—পছন্দ অপছন্দ ভাবার সময় আমি পাইনি এত হঠাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায় হয়ে গেল জিনিসটা। এসব নিয়ে ভাবিসনি।

ভাববার মতো কোনও জিনিস নয় এটা। পৃথিবীতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে, তাদের অনেকের সৎকার হচ্ছে, অনেকের হচ্ছে না, যার যে রকম সিচুয়েশন।

—তো এখন বল, বাবুইয়ের যাওয়াটা তোমার পছন্দসই হয়েছে কি হয়নি। মাসি তোমার উত্তরগুলো আমার কাছে ভীষণ জরুরি। আমি খুব একা, আমার কোনও রোল মডেল নেই। সব প্রশ্নের উত্তর কি নিজে নিজে পাওয়া যায়?

আমি বুঝতে পারলুম আমি ওর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছি। কেন জানি না। একটা এমন সুন্দর প্রতিভাসম্পন্ন মেয়ে, যার হাতে এখন যৌবনের সব-খোল চাবি সে কেন এমন সৃষ্টিছাড়া রোল মডেলের দিকে ঝোঁকে? কিন্তু ওর কথায় যে আকুলতা রয়েছে সেটা অস্বীকার করি কী করে?

—দ্যাখ, হাজার হোক, বাবুইয়ের বাবা তো! ওর সঙ্গে প্রায় কোনও সম্পর্কই ছিল না। কিছুই জানে না ও বাবা সম্বন্ধে। খালি মাঝে মাঝে আদালত মঞ্জুর করেছিল বলে সে এখানে এসে বাবুইকে সঙ্গে নিয়ে বেরোত। আমি কোনওদিন ওকে বাবাকে নিয়ে ভালো মন্দ কিছু বলিনি। ওর তা সত্ত্বেও একটা

বাবা-সংস্কার যখন তৈরি হয়েছে, নিশ্চয় যাবে। যেতে ইচ্ছে হলে যাবে না কেন?

তখন জারিন আস্তে আস্তে বলল—আমি কিন্তু আমার বাবার জন্যে কোনও কাজ করিনি মাসি। যদিও মা চলে যাবার পরে বাবার কাছেই থাকতাম। বাবাই খাওয়াত পরাত, বাবারই আশ্রয়ে থাকা, মদ খেলে বাবা অমানুষ হয়ে যেত, অকথ্য সব গালাগাল দিত, মারত প্রচণ্ড, আমি পালাতাম, বন্ধুদের বাড়ি, স্কুলের হেড-মিসট্রেসের কাছে কাতরভাবে আশ্রয় চাইতাম। কখনও পেতাম, কখনও পেতাম না। দরজা বন্ধ করে কাঁপতাম, আর বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে দিয়ে বাবা জগতের যেখানে যত খারাপ, অশ্লীল শব্দ আছে চিৎকার করে করে বলত। বাবা মাতাল অবস্থায় গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়, মাসি, আমি সেখানে যাইনি, রাস্তার লোকে যা করার করেছে, আমি এমনকী চেনা পর্যন্ত দিইনি যে ওই মৃত লোকটি আমার বাবা। পাড়ার সকলেই আমার অবস্থা জানত, ওরা যখন আইডেন্টিফাই করেছে কাগজে দেখে, আমি ক্রমাগত অস্বীকার করে গেছি—না না, এ আমার বাবা হতে পারে না। বাবা যখন দিনের পর দিন বাড়ি ফিরছে না, তখন সবাই চাপ দিচ্ছে—চল তোকে নিয়ে খোঁজ নিই, আমরা তো আছি। আমার বাড়িওলা ভদ্রলোক ভালোই ছিলেন। যখন দেখলাম আর চাপ সামলাতে পারছি না একেবারে হুট করে পালিয়ে 'উটপাখি'-র পরিচালক প্রযোজক অর্ধেন্দুদার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাই। বাবা মারা গেছেন, আমার কেউ নেই, কী করব বলে দিন। বিপত্নীক অর্ধেন্দুদা পড়ে গেলেন মহা মুশকিলে। অনেকের কাছে পরামর্শ চাইলেন। দলের অন্য সবাই আমার হয়ে ওঁকে বলল। ওখানেই থাকতে লাগলাম। আমি ওঁর বাড়ির সব কাজ করে দিতাম, উপরন্তু সেক্রেটারির কাজ। আমার কোনও অসুবিধে হত না। ওঁর যে খুবই সুবিধে হয়েছিল, বলাই বাহুল্য। তবে সেই থেকে আমার বদনাম। যারা আমাকে আশ্রয় দেবার জন্যে ওঁর কাছে দরবার করেছিল তারাই বদনাম করতে লাগল। বদনাম থেকে নিজে বাঁচব, ওঁকে বাঁচাব বলেই প্রথম বিয়েটা করেছিলাম। টিকতে পারলাম না। তারপর দ্বিতীয়টা। সেখানে আবার অত্যাচার। আমি এখন বুঝছি বিয়েটিয়ে আমার জন্যে নয়। একাকিত্বই আমার নিয়তি।

আমি দেখলুম জারিনের চোখ একেবারে কূলে কূলে ভরা। ওর কোনও বন্ধু নেই যাকে এ সব বলা যায়। কোনও অভিভাবক নেই যার কাছে ভরসা চাওয়া যায়। ও একটার পর একটা নেগেটিভ বিয়ে করছে। তার ওপর বিয়ের জন্য যে ধরনের মানসিক প্রস্তুতি মেয়েদের স্বাভাবিক ভাবেই থাকে, তা-ও ওর নেই। ওর বাবার ইমেজ ওর মনে সবচেয়ে স্পষ্ট। একটা ঘৃণা আর ভয়, যা বারবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন বিয়ের মধ্য দিয়ে। অথচ ও চায়। ওর চোখের জলে তার ছায়া আমি দেখতে পেলুম। সন্ধ্যা-গোধূলি রঙের অভিনয় প্রতিভা বিশিষ্ট মেয়েটি আহা! ওর কোনও পরিজন নেই, প্রিয়জন নেই। আবারও সেই পরিবারহীনতা, পরিবার চাওয়া! মা বাবা ভাই বোন দাদা দিদি স্বামী ছেলেমেয়ে। এই সব প্রার্থনা ওর পূর্ণ হবে কিনা জানি না। গোড়াতেই কিছু কিছু কাটা পড়ে গেছে। বাকিগুলির কী হবে আমার কোনও ধারণা নেই।

দুজনে চুপ করে বসে আছি, আমাদের নীরবতার ওপর দিয়ে সন্ধে হল, রাত হল, রাত ঘন হচ্ছে। আমি উঠে পড়ি। নিজের রান্নাঘরে গিয়ে দেখি আশ্চর্য, কোনও রান্নাটান্না করা নেই। কেন এ রকম হল আমি মনে করতে পারলুম না। কবিতা কি কিছু বলে গিয়েছিল? কদিন আমি নিজের কাজে এত মগ্ন আছি যে হয় তো ভুলে গেছি সব। ফ্রিজ খুলে দেখি আশ্চর্য, রান্না খাবার নেই বটে। কিন্তু কই মাছ কাটা ধোয়া, নুন হলুদ মাখানো রয়েছে। ফুলকপি মটরশুঁটি গাজর পেঁপে সব গোলগোল করে কাটা রয়েছে স্টুয়ের জন্যে। বাঃ। সব বার করে নিয়ে আমি সোৎসাহে রান্নাঘরের দিকে যাই। জারিনও দেখি আসছে। আমি বলি—এই নে এক কৌটো চাল বার করে দিচ্ছি, চটপট করে ধুয়ে দে। আমি ভাতের জলটা চাপিয়ে দিচ্ছি। সাদা তেলের ওপর গোটা গরম মশলা তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে, আমি সব সবজিগুলোকে নাড়াচাড়া করতে থাকি। আদাবাটা গোলমরিচ দিই। টম্যাটোগুলো শুধু আলাদা করে রাখি। জারিন আড়চোখে চেয়ে বলল—প্রেশারে দিলে কিন্তু সব সেদ্ধ হয়ে যেত।

—বড্ড তালগোল পাকিয়ে যায়, আমার হাতে অন্তত।

দেখতে দেখতে ভাত ফোটার সুগন্ধ বেরোতে লাগল। নাকে নিঃশ্বাস টেনে

আমি বললুম আহ, জারিনও প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল—কী চমৎকার গন্ধটা, না?

আমি এখন আমার ছায়া জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসেছি। পুরো অ্যাসফল্টের রাস্তা দিয়ে চলছি। দুপাশে কংক্রিটের বাড়ি সব, তার থেকে দলে দলে মানুষ কাজে অকাজে বেরিয়ে আসছে। মাটিতে পা দিয়ে হাঁটছি, অনেক সমস্যা থাকলেও ভালোই লাগছে।

স্টুটা বেশ এক দলা মাখন আর অল্প একটু ময়দা দুধে গুলে এক ফুট ফুটিয়ে নামাই।

জারিন বলল—তুমিও ময়দা দাও?

—আবার কী দেব, কর্নফ্লাওয়ার নাকি? তুইও যেমন!

দুজনেই হাসতে থাকি, যেন কী একটা দুষ্টুমি দুজনে মিলে হাসিল করেছি!

ভাত নামিয়ে সাবেক পদ্ধতিতে আমাকে ফ্যান গালতে দেখে ও আরেক প্রস্থ অবাক হয়।—তুমিও?

—আমিও। আমরা হলাম আসল বাঙাল।

মাছটাকে ধনে জিরে বাটা দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলুম। এবার কড়ায় অল্প তেল দিয়ে জিরে তেজপাতা শুকনো লংকা ফোড়ন দিয়ে মশলা শুদ্ধু মাছটাকে আস্তে করে কড়ায় নামিয়ে দিই। চাপা দিয়ে দিই। সিম করে দিই গ্যাসটা। একটু পরে ঢাকা খুলে উলটে দিই।

—এটা কী করছ মাসি?

—তেল কই।

ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে বলল—যাক, একটা নতুন রান্না শেখা গেল।

—আগে জানতিস না?

—করবার অকেশন হয়নি কখনও। যা তাড়াতাড়ি হয়, সহজে হয়, তাই-ই করতাম তো!

একপলা সরষের তেল ছড়িয়ে দিয়ে মাছটা নামাই। তারপর ও টেবিলে জায়গা করে, আমি খাবারগুলো নিয়ে যাই। দুজনেরই প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, তবু একটু খানি ঠান্ডা হতে দিই সব। তারপর দুজনে খেতে বসি। কী যে মজা কী বলব। আমি ওকে বলি—ভাতটা তো দারুণ করেছিস, একদম ঝরঝরে, অথচ নরম। ও আমাকে বলে— মাছটা যা রেঁধেছ না যে বয়সে

খাবে সেই বয়সে থাকবে।

স্টুটা কে করেছে তবে? আমি চেঁচিয়ে বলি—ওরে কবিতা, তোর ইস্টুটা ভালোই উতরেছে। জন্ম জন্ম এরকম ইস্টু রাঁধ—

—এ রকম অ্যাপ্রিসিয়েশন জুটলে আমিও জন্ম জন্ম স্টু রাঁধতে রাজি আছি। জারিন বলল। ওর মুখে এই সময়ে একটা অদ্ভুত মোহন হাসি ছড়িয়ে যায়, যেন আনন্দের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে গেছে। আমার মনে পড়ে সেই দূর শৈশবের না খেতে পাওয়ার দিনগুলো, যখন ভাতের ডেকচিতে কচি হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলুম। দিনের পর দিন সকালে পোস্তর ঝোল আর রাতে ডিমের ঝোল, সকালে পোস্তর ঝোল আর রাতে ডিমের ঝোল, মাঝে মাছে স্বর্গীয় অবকাশ, বড়দি এসেছেন, সমস্ত সংসারের ভার বড়দির হাতে। ছাত থেকে মা জামাকাপড় তুলে এনে দিয়েছেন, আমরা হাসতে হাসতে কাড়াকাড়ি করে সে সব ভাঁজ করছি, ময়নার হাতে ইস্ত্রি, পরপর গুছিয়ে রাখছে আর গরম ইস্ত্রির টান মারছে। সকালে তেতোর ডাল, পটোল ভাজা, মুড়ি ঘণ্ট, রাতে টানা রুই মাছের ঝোল, আর কিছু চাও তো আলু ভাতে কাঁচাকলা ভাতে। গাছের মোচা কখনও বাড়িতেও আসত না, বড়দি থাকলেই আসবে। আমরাও উৎসাহ করে মোচার নৌকা আর দাঁড় ছাড়াতে লেগেছি। থোড়ের সুতো আমিও হাতে জড়াব বড়দি, আমিও এঁচোড়ের আঠা ছাড়াব তেল দিয়ে। কত আবদার! কত আবদার!

মনে পড়ল—বাবা শুয়ে। মা পাশে বসে বই পড়ে শোনাচ্ছেন। ময়না বলছে—এই চাল ধুয়ে দিলুম, ভাত নামাতে ডাকবে। যাঃ, হাতটা কাটলে তো! অনভ্যাসের আনাজ কাটা। কচ করে কেটে গেছে। চিনি চেপে ধরি সেখানটায়। বাকি কুটনো ময়না গজগজ করতে করতে কেটে দেয়। আমি চচ্চড়ি রাঁধি, অবিকল বড়দির মতো করে। অড়হর ডাল রাঁধি। মাছ ভেজে সারি। বাবার জন্যে একটা চিকেন সুপ থাকবেই থাকবে। এটা রোজ টাটকা করি। আর টাটকা না করেই বা কি উপায়। তখন সেই তারকেশ্বরের সেকেলে বাড়িতে তো আর ফ্রিজ ছিল না। বিকেল হলেই বিশাল জামবাটিতে মুড়ি ঢেলে একেক দিন একেক রকম করে মাখি, জাম্বো হাঁড়িতে চা হয়। দুধ চিনি সব দিয়ে ফোটানো চা। কী ভাগ্য, ময়না বিবি সেটা পরিবেশনে সাহায্য করতেন। নতুন করছি তো! তার মধ্যেও একটা আনন্দ ছিল। চা-টা খুব

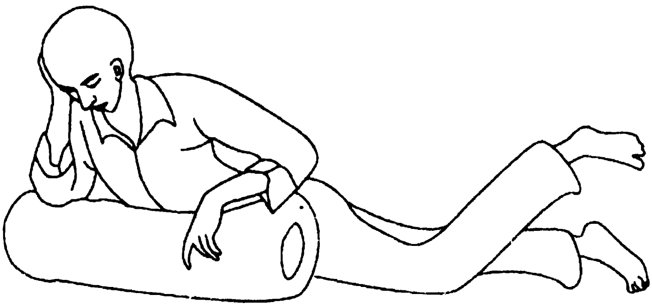
ক্লান্তিকর। কিন্তু রান্নাটা ষোলো আনা এনজয় করতুম। সর্বক্ষণ বড়দিকে মনে পড়ত। রান্নাটা যেন একটা রিচুয়্যাল, ওই রিচুয়্যালের ভেতর দিয়ে বড়দিকে স্মরণ করছি। অনেক সময়ে মা বলে বলে দিচ্ছেন, আমি শুনে শুনে করছি। মা খুব অল্প সময়ে নিজে করতেন। তখন পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম কি অসম্ভব পারিপাট্য আর নিষ্ঠার সঙ্গে করছেন কাজটা, মা করছেন আমি শিখে নিচ্ছি। মনে প্রশ্ন জাগছে, জিজ্ঞেস করে ফেলছি—মা তুমি তো রান্নাটান্না সবই ভীষণ ভালো পার, তাহলে?

—তা হলে কী?

আমি বাকি প্রশ্নটা করি না, কেননা মায়ের সঙ্গে আমার সে রকম ঘনিষ্ঠতা নেই।

মা বলেন—কী বলতে চাস? করি না কেন?

আমি নিরুত্তরে চেয়ে আছি। মা বললেন—এগুলো কেন অনেক কিছুই আমি পারি, এগুলো অনেকেই পারে। কিন্তু আরও অনেক কিছু আমি পারি যেগুলো অন্য লোকে পারে না, এখন বল তো খুকু আমি কোনগুলো করব? তা ছাড়া, আমাদের মতো সম্পন্ন পরিবারে যদি রান্নাটান্না বাড়ির বউ মেয়েরাই করে নেয় তাহলে এই বামনি, উদাসী এদের মতো লোকেরা যাবে কোথায়? একটু থেমে মা বললেন—তোমার বড়দি এ সব করতে ভালোবাসত, আর একটু থেমে বললেন—ও তো আর কিছু পারত না! অতি বড় ঘরনি না পায় ঘর—বলে মা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। দীর্ঘনিশ্বাস ও মন্তব্য সবকিছু মিলিয়ে আমি দুটো উপাদানের খোঁজ পেলুম মায়ের মধ্যে, যেগুলোর কথা আগে জানতুম না। এক, মা বড়দিকে হিংসা করেন, যে বড়দি আর ইহজগতে নেই, অতি শোচনীয়ভাবে দেহান্ত হয়েছে যাঁর। দুই, মা বড়দিকে করুণাও করেন, কষ্ট পান তার জন্যে। এই দুই বিপরীত বোধ মায়ের মধ্যে রয়েছে। হিংসা করার জন্যে যদি আমি মাকে খারাপ বাসি তাহলে করুণাটার জন্যে মাকে ভালোবাসতেও হয়।



চোদ্দো দিন পরে বাবুই ফিরল এক সকালবেলা। ওর গায়ে হাফ হাতা লম্বা ঢোলা শার্ট, পরনে সাদা পাজামা, মনে হল দুটোই কড়কড়ে নতুন। ওর মাথা পুরো ন্যাড়া, গোল বেলের মতো। ওকে এমন আমি কখনও দেখিনি, চিনতে পারা শক্ত কারও পক্ষে, ব্লু জিনস আর টি শার্ট এই আজকালকার ইউনিফর্মে ও এত পরিচিত! আমি তখন আরামচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। মুখটা আমার প্রায় ঢাকাই। পাশে টেবিলে আমার আধ-খাওয়া ব্রেকফাস্ট। আজকেই বলে দিয়েছিলুম আমাকে খানদুয়েক বড় বড় মুচমুচে টোস্ট দিতে, একটা মাখন দেওয়া, আরেকটা জ্যাম লাগানো। একটা বড় হাঁসের ডিমের ওমলেট, বেশ খানিকটা স্যালাড ছিল। কফি-পটে অন্তত দুকাপ কফি। সদর দরজাটা খোলাই ছিল। দরজা ঠেলে ঢোকবার শব্দে আমি মুখ থেকে কাগজটা সরিয়েছিলুম, তাতেই দেখতে পেলুম। ঢুকে ও আমার দিকে তাকাল না, চলে গেল নিজের ঘরের দিকে। আমি চেঁচিয়ে বললুম—কবিতা, ভাই এসেছে, ও কী খাবে জিজ্ঞেস করে দে। কোনও সাড়া এল না। আমি আবার চেঁচালুম। তখন রান্নাঘর থেকে উনি উত্তর দিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি শুনতে পেয়েছি।

আমি আমার শেষ টুকরো ওমলেটের সঙ্গে শশা গেঁথে মুখে পুরছি, কবিতা এসে বলল—ভাই কিছু খাবে না বলছে।

—তো ঠিক আছে। দুপুরের জন্যে আজ ওর রান্না করে ঢেকে রেখে যেও।

আমি তো খাব না।

ও বলল—ভাইয়ের মাথা ন্যাড়া কেন? কে গেল?

আমি বললুম—তোর রান্না শেষ হতে আর কত দেরি:

ও ছাড়বার পাত্র নয়, বলল—বাবা-মা ছাড়া এক রইল দাদু। ভাইকে ভালো বলতে হবে দাদুর জন্যে মাথা মুড়িয়েছে। আর কেউ ছিল না বুঝি?

আমি উঠে পড়লুম। —কবিতা আজ আমার ফিরতে দেরি হবে, আমি কিন্তু এখনি বেরিয়ে যাচ্ছি।

কবিতা বলল—তুমি দিদি শ্বশুরের জন্যে অশুচ পাললে না। যতই দুষ্টু হোক, তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করুক আর যাই করুক, এগুলো কিন্তু নিজেদের সোয়াস্তির জন্যেও করতে হয়। অনিষ্ট অকল্যাণ ডেকে আনে।

আমি কড়া চোখে ওর দিকে তাকাই—কবিতা!!! একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছ না?

ও চোখ নামিয়ে চলে গেল, কিন্তু একটা অশ্রদ্ধার আভাস যেন ওর চোখে মুখে লেগে আছে।

আমি সাজ-সজ্জা করে বাবুইয়ের ঘরের মুখে যাই। ও একেবারে বিছানায় কাত মাথার পেছনে কাত মাথার পেছনে দুই হাত। কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছে না চোখ বুজিয়ে, ভালো বুঝতে পারলুম না। বললুম—বাবু, আমি লাইব্রেরিতে বেরোচ্ছি, সারাদিন থাকব না। তুমি দুপুর বেলায় ঠিকঠাক খেয়ে নিও তাহলে। রাত্তিরে ফিরে এসে কথা হবে!

ও কোনও হুঁ হাঁ করল না। আমি বেরিয়ে গেলুম।

সারাদিন কাজ করছি আর বাবুইয়ের মুখটা আমার মনে পড়ছে। একদম চুপ। হলটা কী? এ কদিন আমি ওকে একেবারে ফোন করিনি, তবে টুকাই আর চয়নকে ফোন করে খোঁজ নিয়েছি। ও হয়তো খুব একটা নিয়ম কর্মের মধ্যে রয়েছে। ওর যখন সময় হবে ও-ই ফোন করবে। সেটাই ভালো। কিন্তু তা-ও ও করেনি। কেন করছে না এ নিয়ে আমি খুব বেশি ভাবিনি। ও যখন বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও যায়, একবার দার্জিলিং আরেকবার চক্রধরপুর গিয়েছিল, ফোনটোন করেনি। তখন অবশ্য ওর সেল ফোন ছিল না। যাক গে, এখন যেটা করছি সেটাই তো ভালো করে করি! এইভাবে বাবুইয়ের চিন্তা আমার মাথার মধ্যে থেকে কখন বেরিয়ে গেছে! চারটের সময়ে উঠে পড়লুম, তখন

চিন্তাটা আবার ফিরে এল। বাড়ি ফিরে এলুম। বাবুই তো নেই! যাক বেরিয়ে গেছে। মনটা বেচারার একটু খারাপ হতেই পারে। সম্পর্ক তো একটা! যতই সম্পর্ক না থাক। মৃত্যুও তো বটে! এই প্রথম বোধ হয় ওর মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়।

সারাদিনের কাজের ক্লান্তি এখন আমায় আঁকড়ে ধরেছে। শীতটা পড়ি পড়ি করেও যেন জমিয়ে পড়ছে না। খালি বিষাদ বঙের ধোঁয়া চারদিকে। গাড়ির অক্লান্ত আওয়াজ। গাড়লের মতো কেশে যায়, কেন যে গাড়িদের সম্বন্ধে বলেছিলেন কবি যেন স্পষ্ট বুঝতে পারি। জল গরম করে একটু গা ধুয়ে নিই, অস্বস্তিটা কাটা দরকার। কত যে ক্লেদ বাইরে থেকে নিয়ে ঢুকেছি কে জানে! একটা হালকা কাঁথা গায়ে ফেলে আমি চুপচাপ শুয়ে থাকি।

—মা, তুমি কবিতাকে বলেছ আমার দাদু মারা গেছেন?

চমকে আমি চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছি।

—সে আবার কী? কখন বললুম?

—ও তো তাই বলল।

—ও ঠিক বলেনি। ও নিজেই স্পেকুলেট করছিল, আমি ওর কৌতূহলের জবাব দেওয়া দরকার মনে করিনি।

—আমার বাবা মারা গেছেন এই সোজা কথাটা ওকে বলে দিতে এত কী অসুবিধে? কৌতূহল মানুষের স্বভাব। উত্তরটা দিলে ওর স্পেকুলেশনটা থেমে যেত। শুধু তুমি যে ডিভোর্সি এই কথাটা বেরিয়ে আসত। তাতে তোমার অসুবিধে কী মা?—

—কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু এটা কোনও ইস্যু নয় বাবুই। লোকজনের অকারণ কৌতূহলের প্রশ্রয় দেওয়া আমার কোনওদিনই পছন্দ নয়। এখন ইস্যুটা কী বলো। তোমার কোনও কারণে একটা অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, সেটাই বল।

ও বলল—আমার বাবা আমাকে তাঁর সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী করে গেছেন। ছেলেকে ভালো না বাসলে এটা কেউ করতে পারে?

—তুমি কি বাবার টাকা দেওয়ার সঙ্গে ভালোবাসাটা ইকোয়েট করছ বাবু? করা যায় না, আবার করা যায়ও। তোমার বাবার দেবার মতো কেউ ছিল

না। এক যদি চ্যারিটি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তো তোমার খরচপত্রও আজীবন দিয়ে গেছেন আমি সেটা ব্যবহার করি আর নাই করি, অর্থাৎ ছেলের দায়টা তিনি স্বীকার করতেন, তাহলে দেবেন না-ই বা কেন?

—উনি আমার খরচপত্র দিতেন? আমায় বলোনি তো?

—তোমার বয়স হবে তবে তো বলব? তাছাড়া উনি তো তোমাকে ক্লেম করছিলেন, আদালতেরও নির্দেশ ছিল দেওয়া। সেই মতো উনি তোমার সঙ্গে মেলামেশাও করতেন। আমি তো কোনও বাধার সৃষ্টি করিনি।

—তুমি কখনও আমাকে ওঁর কাছে থাকতে দিতে চাওনি।

—সেটা ভালো হত না। আমি ওঁকে চিনি। হয়তো তোমাকে আটক রাখতেও পারতেন। সেই নিয়ে কোর্টকাছারি করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না আর।

—উনি নিশ্চয় তোমাকেও অ্যালিমনি দিতে চেয়েছিলেন।

—আমি চাইনি, ও নিয়ে কোনও কথাও হয়নি। তোমার জন্যে দেওয়া টাকা ব্যাংকে আছে। এখন উনি মারা গেছেন, তোমার উচ্চশিক্ষার জন্য যদি চাও তো খরচ হতে পারে।

—উনি আমাকে যা দিয়ে গেছেন সে টাকা হাতে পেলে আমার কেন আরও ক'জন ছেলের উচ্চশিক্ষা হয়ে যায়। জমা টাকার পরিমাণই সত্তর লক্ষ, বাড়ি জমি জায়গা বিক্রি করলে আরও বেশ কিছু যোগ হবে। কোনওদিন আর বিয়ে করলেন না, করলে ওঁর পরিবার হতে পারত, ছেলেমেয়ে হতে পারত। আমাকে খুব বেশি ভালো না বাসলে বাবা কি এটা করতে পারতেন?

—যে ছেলে হাতের কাছে নেই, তার কথা মনে করে কোনও পুরুষ বিয়ে করে না এ রকম হাস্যকর কথা আমি এই প্রথম শুনলুম। আমি হাসি। হাসিটা তেতো। এত কথা বাবুইকে বলতে হবে যে বাবুই আমার হাতে আদ্যন্ত মানুষ আমি ভাবিনি।

—তাহলে কেন? তুমিই বলো। উনি কি তোমার কথা মনে করেই...

—উনি বিয়ে করবার অবস্থায় ছিলেন না। করতে পারলে তো ভালোই হত, তোমাকে এইসব কৈফিয়ত দেবার দায় থেকে আমি রেহাই পেতুম।

—তুমি কী যে বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মা। আমার ওপর ওঁর এতই ঝোঁক যে আমার হাতের আগুন চেয়ে গেছেন উনি উইলে। আমি

যেন ওঁর শ্রাদ্ধ করি।

—মানে?

—মানে তো সহজ। না বোঝবার কী আছে?

—না, উইলে লিখে যাবার কথা কী বললে?

—উইলে আছে আমি যেন ওঁর মুখাগ্নি করি, শ্রাদ্ধ করি, তারপর ওঁর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে হয়ে যাবে। আমাকে যদি পাওয়া না যায়, তাহলে সব যাবে মিশনে। আমি অ্যাভেলেবল না হলেই তাই হত। টুকাইদাই তাড়াতাড়ি করে আমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে, বাবার শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে।

—শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে না উইলের শর্ত পূরণ করতে? আমি ওর দিকে অপলক চাই।

—মানে?

—মানে যা তাই। তোমার উত্তরাধিকার তুমি এমনি পাওনি বাবু, উইলে কনডিশন করে গেছেন তোমার বাবা। এইভাবে উনি আমার কাছ থেকে তোমাকে লুঠে নিয়ে নিজের সঙ্গে জুড়ে নিলেন। ধুরন্ধর উকিলের শেষ চাল। এই উইলের পেছনে তুমি নেই, আছি আমি। আমার ওপর শোধ নিতেই।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি দুজনে। বাবুই বলে—আমাকে লুঠে নিলেন...তোমার ওপর শেষ চাল...কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। লুঠে নেওয়া যায়? এভাবে?

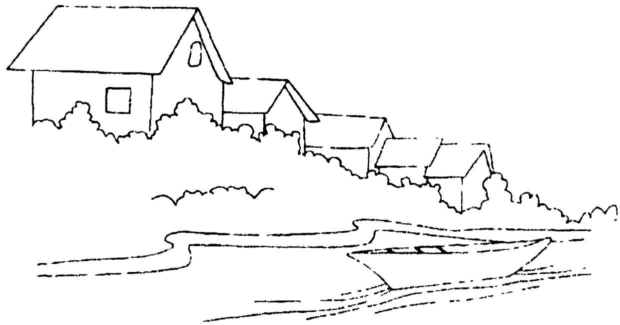
আমি বিষণ্ণ স্বরে বলি—যায় কিনা অদূর ভবিষ্যৎ বলবে বাবু। টাকা-পয়সা বড় বিষম জিনিস। বিশেষ করে তা যদি আবার নিজের উপার্জন করা না হয়। আর...আর...লোভ জিনিসটা আমার একেবারে পছন্দ নয়।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ও আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। আমি প্রায় বজ্রাহত বসে রইলুম। এ জিনিসটা আমার ভাবনায় ছিল না। বরাবর যতদূর সম্ভব সৎভাবে ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে আমি অসীম পরিশ্রম করেছি। ওর বাবার টাকা দেয় ছিল। তিনি দিতেন, যতদূর সম্ভব কম। তবু তো কিছু! ছেলেকে ভালো স্কুলে পড়ানো, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানোর জন্য এই যে আমি প্রাণপাত করলুম সেটা তা হলে কেন? দরকার ছিল না তো!

ও যদি সাহেব ভটচাযের উত্তরাধিকারী হবে, শর্তসাপেক্ষ উইল গ্রাহ্য করবে, টাকাকে ভালোবাসা ভাববে, তা হলে কী দরকার ছিল এ সবের? একবারও আমাকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না? টুকাই নিশ্চয় উইলের শর্ত জানত! সাহেবদাই জানিয়ে রেখেছিল। তাই কিচ্ছু ভাববার অবসর না দিয়ে ছেলেটাকে এক রকম উড়িয়ে নিয়ে গেল।

রাগ? রাগ করেই বা কী করব? ছেলে তার বাবার সম্পত্তি পেয়েছে, এর মধ্যে তো দূষণীয় কিছু নেই। আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ সরল হিসেব। আপত্তি করছি কেন? খুব সম্ভব টুকাইও বুঝবে না। ওর ধারণা আমার সাহেবের ওপর খুব রাগ তার থেকেই যত বিপত্তি। তাই শর্তের কথাটা গোপন করে ভাইকে নিয়ে গেছে। আমি ওদের কাছে কাঠগোঁয়ার একজন সৎ মেয়ে। যদি খুলে বলি তাহলেই বা কজন বুঝবে? এই বয়সে লাখ লাখ টাকা হাতে পেলে কী করতে হয়, তাই-ই কি ওই ছেলে জানে?

ঠিক আছে, অনেক ভেবেচিন্তে নিজেকে দুর্ভাবনামুক্ত করি, এবার পরীক্ষা হয়ে যাক শিক্ষা আর পরিবেশ বড় না জিন বড়। জিনের মধ্যেও এক্স বড় না ওয়াই বড়। এই নিঃশব্দ চ্যালেঞ্জের চিন্তা আমাকে সারারাত ছাড়ে না। চাঁদ অস্ত যায়।



সত্যিকারের শীতল সকাল। কাল রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে। মেঘমুক্ত আকাশ। আবহাওয়া পরিষ্কার। শ্বাস নিতে কোনও কষ্ট নেই। এমন একটা দিনের দাম এখন কোটি টাকা। এবং আমি উত্তাল নীলে চিলের হ্রেষা শুনতে পেলুম। বহু বহু কাল পরে। সেই ছোটবেলায় তারকেশ্বরের বাড়ির ছাতে মা যখন ফুলগাছে জল দিতেন আর গান গাইতেন, তখন দেখেছি আকাশে চিলের শান্ত অথচ সতর্ক ওড়াউড়ি। তারা প্রমোদভ্রমণ করছে না শিকারের লক্ষ্যে আছে বোঝবার জো থাকত না। ওই নেমে আসছে ক্ষিপ্রগতিতে। ঝাঁপ খাচ্ছে, একেকটা ঝাঁপে নেমে আসছে কত মিটার কে জানে! ঝাঁপিয়ে পড়েছে নির্ভুল লক্ষ্যে ঝাঁকের শেষ পায়রাটির ওপর, বিশাল ডানা মেলে নামছে উঁচু বাড়ির কার্নিশে। কী লোমশ, উলের মোজা পরা গোদ গোদা পা। কাছ থেকে কী বড়! কী হিংস্র! দূরে ওরা যতখানি কবিতা, কাছ থেকে ততখানিই রূঢ়। ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলছে পায়রাটাকে। আকাশের বাঘ। আজ অনেককাল পরে ওদের ডাক শুনে পুরো ছবিটা এক লহমায় আমার চোখে ভেসে উঠল। শীতের অনুষঙ্গ। নীল ফ্লানেলের ফ্রক। মেরুন রঙের সোয়েটার, দুই দিদিতে মিলে বুনেছে। আমার জীবনে একটা মস্ত বড় প্রাপ্তি। কমলালেবু যাচ্ছে। ডাক, ডাক ভুলদা, এই ময়না বাবার কাছ থেকে পয়সা এনে দে না রে! হুর রে ছো-মাসি। হরিপালের ধানিজমিটার ভালো দাম পাওয়া গেছে। আমাদের পুকুরটা নিতে

চাইছে। বোজাতে পারবে না কনডিশন মেনে নিয়েছে।

হরিপালের জমি! ওইখান থেকেই আমাদের সংবচ্ছরের চাল আসত। দুধেশ্বর আর চামরমণি। না না ধানীজমি অত ভালো, চাষ করবে বলেই কিনছে। পাশের, ওই যে গদাই নস্কর, তুই বোধহয় চিনিস না। হাঁ হয়ে গেছে বিক্রি করব শুনে! বলল—ঠাকুর মাটিকে মা মানতেন। কত কষ্ট করে রোজগারপাতি করে কিনেছিলেন, তোমরা কী কুলাঙ্গার গো সব, বেচে দিচ্ছ? তো আমাকেই দাও। কিষাণের জমি কুচি কুচি হয়ে যায়, যতগুলান মুখ ততগুলান কুচি। এই করে করেই আমাদের এ বাংলা গেল গো দাদাবাবু। তোমাদের ঘরেও যদি ভাগে খেতে এতগুলান মুখ, তবে আমাদের ঘরের কথা চিন্তা করো। আমার খুব দুঃখ হচ্ছিল জানিস, যদি পুকুর আর হরিপালের জমিটা অন্তত রাখা যেত! তুই নিজের জন্যে রাখতে পারতিস!

আমার কোনও মায়া নেই। কিন্তু এই সব জমিজমা পুকুর বাড়ির জন্যে আমায় কোর্টকাছারিও করতে হয়েছে। যেটুকু শিখেছি ওইভাবেই শিখেছি। মা চাইতেন আমি আইন পড়ি, এইসব রক্ষা করবার জন্যে। আমি হঠাৎ কোনও উত্তর করতে পারলুম না। আমি দেখছি একটা বিরাট চিল ডানা মেলে নেমে আসছে, এখুনি সে পায়রাটাকে কবজা করবে। ছিঁড়ে খুঁড়ে তছনছ করে দেবে একেবারে। কত যত্নের ট্রেইন্ড পায়রা গো! কপালের মাঝখানে দু আঙুল রেখে আমি মাথা নিচু করে ফেলি। চুপচাপ বসে আছি। টুকাই একটু পরে বলল—অত কষ্ট হলে আমি তো বলছি হরিপালের জমিটা তুই নিজের রাখ, পুকুরটা না হয় আমি রাখব। ওগুলোর দাম ধরে সব ভাগাভাগি হবে। অসুবিধে কী! মামারা কেউ ওসবে ইনটারেস্ট নেবে না। মাসিরা তো নয়ই। শুধু আমি আর তুই। আমরা বুঝি।

আমি মনে মনে বলি—তুইও বুঝিস না রে টুকাই। তুই খালি মামার বাড়িরটা খেয়েই ছিস। একটু বড় হতে না হতে চাকরির জন্য, বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলি। তুই ভালোই জানতিস এতগুলো জাঁদরেল জাঁদরেল মামা থাকতে তুই এখানে কখনওই দাঁত ফোটাতে পারবি না। কাজেই বুদ্ধিমানের মতো সরে পড়াই ভালো। কোনওদিন তুই জমিজমা পুকুর দেখাশোনা করেছিস বলে আমার জানা নেই। মা লোক ধরে ধরে করাত। তাছাড়া সাহেবদার সঙ্গে তো আবার গোঁসাইবাড়ির আঁতাত হয়ে যায় আমি

চলে আসার পর। সে কতটা কী করেছে আমার জানা নেই।

—কী ঠিক করলি?

—কী আবার! সেই নিয়ে আবার কথা উঠবে। মতামত আলাদা হবে। ও সবের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই।

—যা ভালো বুঝিস। একটু কি জানতে পারি তুই কী ভাবছিস?

জবাবটা এড়ানোর জন্যে আমি বললুম—তুই বাবুইয়ের বাবার উইলের কথাটা জানতিস, না?

—অবশ্যই, বাহাদুরের ভঙ্গিতে হাঁটু চাপড়ে ও বলল, আমাকে ফাঁকি দেবে? দিদাইয়ের কাছে একদিন বলছিল, আমি শুনে ফেলেছি।

—মায়ের কাছে?

—হ্যাঁ, দিদাইয়ের কাছে তো জো হুকুম ছিল। একদিন শুনছি দিদাই বলছেন—সাহেব তোমারও তো বয়স হল, একটা উইল করো, উনি যেমন করেছিলেন, আমি যেমন করেছি।

—কবব বলছ? তোমার মেয়েকে আমি দগ্ধে দগ্ধে মারব, সুহাসদি, ও আমাকে যা অপমান করেছে...

দিদাই বললেন—কে যে কাকে দগ্ধে মারে সাহেব? ও সব ঈশ্বরের মাপা আছে। তা তুমি এক কাজ করো না, আশ্রম-টাশ্রমকে দিয়ে যাও। যারা সত্যিকার জনসেবা করে তাদের।

সাহেবমামা রাজি হল না। বলল—আমি কষ্ট করে রোজগার করব আর সেটা পাঁচভূতে লুটে খাবে? তা হবে না। আমি আমার ছেলেকেই দিয়ে যাব। কিন্তু সে যদি আমার শেষ কাজ করে তবেই, নইলে...খুব রেগে গিয়েছিল সেদিন সাহেবমামা। তোমার মেয়েকে আমি আমার নুন খাওয়াবই। এত বড় আস্পদ্দা সে আমার মুখে থুতু দিয়ে বাইরে গিয়ে ভিখ মেঙে, রাঁধুনিগিরি করে খেল, আমার ছেলেকে...জানো কি একটা সাহেবের সঙ্গে থাকছে ইদানীং?

দিদাইয়ের কী হাসি কী হাসি। সত্যি ছোমাসি কেন ওকে ডিভোর্স করলি এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

—যে দিন বাড়ি ফিরে এসেছিলুম, সে দিন তো তুই ছিলি, জানিস তো কী অবস্থায় ফিরি!

—তারপর তো শুনেছি অনেক নাকখত দিয়েছে।

—স্বভাব নাকখত দিলেই তো যায় না। যাক ওসব কথা আমি আলোচনা করতে চাই না।

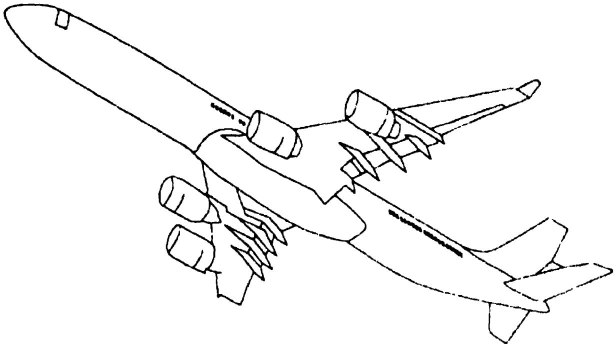
—ঠিক আছে না চাইলি। কিন্তু ছেলের কাছে একদিন জবাব দিতে হবে। আমাকে তো জিজ্ঞেস করছিল।

আমি এবার ওর দিকে তাকাই—তুমি কী বললে?

—বললুম আমি অত ভেতরের কথা জানি না। তবে তোর বাবা তোর মায়ের ওপর খুব অত্যাচার করত। জানো ছোমাসি, যখন ফুলের মালা গলায় দিয়ে শুয়েছিল, সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরে, কপালে চন্দনের তিলক, বোজা চোখের ওপর তুলসীপাতা, দেখাচ্ছিল সাধুসন্তের মতো। কে বলবে এই লোকটা স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করেছে। লোকে কত ভক্তিভরে প্রণাম করলে,

—তুইও করলি নাকি?

—আমি তো করবই, আমার তো মে. সা...বলে ফেলে টুকাই জিভ কাটল।



একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস! যে মেয়েকে একদিন তার বাপের বাড়ি উপেক্ষা করে, শাসন করে, অবশেষে বার করে দিয়েছিল. এক পয়সা যে সঙ্গে আনতে পারেনি, কেউ যার কথা কোনওদিন ভাবেনি, আজ তারই হাতে সব। তারই কাছে সব ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনবরত ফোন আসছে। এটা লালদার, তো ওটা দুলদার, এই বিশ্বেশ্বরী করলেন তো ওই ফুলেশ্বরী। টুকাইয়ের বউ ফোন করেছিল, নিশ্চয় তার পতিদেবতা করিয়েছেন। আমাদের কথা একটু ভেব ছোটমাসি, দুটোই মেয়ে। ইস্কুলে যা পলিটিকস! নীলদা সুদ্ধু একদিন ফোন করেছিল—কী রে পাগলি, দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে? ভালো খেলছিস, কাঁচা কাঁচা মুণ্ড নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলো মা! খুব নার্ভাস গলা পাই চয়নের। মাসি আর কতদিন নেবে ডিসিশন নিতে?

আমার শুধু একটাই অপেক্ষা। কবে ওরা মাকে আমার কাছে দিয়ে যাবে। আমি মাকে একা পেতে চাই। মুখোমুখি হতে চাই। এখন আগুন মরে এসেছে। আর সেই উদ্যত খাঁড়ার মতো প্রশ্ন নেই, সেই সব যন্ত্রণা নেই। নেই সেই সব সংকোচ, স্নায়বিক ভয়, সন্ত্রমবোধ। এখন মা একজন মেয়ে উওম্যান, কোনও ছবির চিরস্থির মোনালিসা নয়, আর আমিও একজন মেয়ে। উওম্যান টু উওম্যান একটা সংলাপের অপেক্ষায় আছি আমি।

সুহাসিনী গোস্বামী আসছেন। দুলদা তাঁকে নিয়ে ফ্লাইটে উঠেছে। ওঠবার

আগে ফোন করে জেনে নিয়েছি। ওরা ওঁকে পাঠাবে কি না, উনি আসবেন কি না, আমার সন্দেহ ছিল ওদের ট্রাম্প কার্ড উনি। যখনই দেখবে কেস হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখনই ওঁকে খেলবে ওরা, উনিও খেলতে দেবেন, কেন আমি জানি না। উনি তো এও জানেন আমার মুখোমুখি হওয়া ওঁর পক্ষে শক্ত। উনি আর আমি, মাঝখানে কেউ নেই, কিছু নেই, ছেলেমানুষি দ্বিধা, সমীহ এ সবের আড়ালও তো এখন উনি আশা করতে পারেন না আর। উনি কি সত্যি আসবেন? পেটের ভেতরটা কুলকুল করছে আমার। যেন ওঁদের নয়, আমারই প্লেন ঠিক অফ করছে।

দুপুর দুটো বাজল। সোজা চেয়ে চেয়ে আছি। নানা ডোমেস্টিক ফ্লাইট আসছে। লাগেজ সংগ্রহ করে দলে দলে আসছে। একগুচ্ছ এসে গেল, তারপর ফাঁকা, আবার দু জন, তারপর বেশ একটা স্রোত। হঠাৎ অপরিচিতের ভিড়ে দুলেন্দ্র ভেসে উঠল। কুচকুচে কালো চুল, কুচকুচে কালো গোঁফ, ধবধবে ফরসা মুখ। শরীরটা শার্ট প্যান্টের ভাঁজের মধ্যে কেমন লুপ্ত হয়ে আছে। যেন শার্ট প্যান্টই এগিয়ে আসছে, মানুষ নয়। আর কালো চুল কালো গোঁফ এ সব সত্ত্বেও বুড়ো, একেবারেই বুড়ো লোক একটা। দুলদা, এত সুকুমারদেহ হয়েও তুই শেষ পর্যন্ত অকালবৃদ্ধ হয়ে গেলি? তারপর দেখলুম উত্তর পূর্বাঞ্চলের এক গাউন পরা মহিলা আসছেন, পাশে পাশে শাদা শাড়ি পরা একজন। চেনা অথচ চেনা নয়। কোনও পূর্বপরিচয় সাপেক্ষে নয়, সম্পূর্ণ অচেনা চোখে অচেনা মানুষকে দেখছি। অনম্য একজন। তিনি মহিলা কি পুরুষ, বৃদ্ধা কি প্রৌঢ়া এই সব প্রশ্নগুলো একেবারেই গৌণ। একজন ব্যক্তি, পূর্বাঞ্চলের মহিলাটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সমান তালে হেঁটে হেঁটে আসছেন। ঠিক পেছনে একজন ওই অঞ্চলেরই স্যুট পরা ভদ্রলোক, তিনিও কথা বলছেন খুব আগ্রহের সঙ্গে, মাঝে মাঝে পাশাপাশি হচ্ছেন, আবার পিছিয়ে পড়ছেন, দুলদা একেবারেই দলছাড়া হয়ে যাচ্ছে, ও ঠেলে নিয়ে আসছে লাগেজ। কী বলছেন উনি? কী ভাষায়? আমি যতদূর জানি ইংরেজি বা হিন্দি কোনটাতেই তেমন সড়গড় নন উনি। বিষয়ই বা কী?

আরেকটু কাছে আসতে ওই দু জনকে অভ্যর্থনা করতে এদিক থেকে কিছু সরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হাত নাড়তে লাগলেন. ওঁদের হাতে ওয়েলকাম

বোর্ড, ওয়েলকাম টু ওয়েস্ট বেঙ্গল, অন বিহাফ অব দা গভমেন্ট—। ওঁরা ফিরে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলার হাতদুটি ধরলেন, কিছু বললেন, সমীহ এবং আন্তরিকতাটা স্পষ্ট বোঝা গেল, তারপর এগিয়ে এলেন ওয়েলকাম পার্টির দিকে। ভদ্রমহিলা একটু থেমে পড়েছেন, আমাদের সঙ্গে, আমার সঙ্গে চোখ মিলল, চোখদুটি কুঁকড়ে গেল হাসিতে, ঠোঁটদুটি সামান্য প্রসারিত হল, আমি দেখলুম বয়স্কার শরীরে যুবতী। উনি ক্লান্তিহীন, আগ্রহে উৎসাহে এখনো উদগ্র, এবং এক বিদ্যুচ্চমকে আমি বুঝলুম পরিবারটি ওঁর জীবনে একটি দুর্ঘটনামাত্র, উনি আমাদের কেউ নন, একেবারেই উল্কাপ্রতিম, অন্য কোন গ্রহাণু যার উপাদান আমাদের রসায়নশাস্ত্রে নেই।

আমার ঘরটা উত্তর পুবে। একটা জানলা দিয়ে আমি ধ্রুবতারাকে সোজা দেখতে পাই। মিটমিট করছে, অনুজ্জ্বল, কিন্তু শান্ত, ধীর এবং ওই, ধ্রুব। দশ তলায় এই ঘর, একেক সময়ে আকাশের মুখোমুখি হয়ে থাকে। আজ আমার তেমনই মনে হচ্ছে, যেন খোলা আকাশের নীচে শুয়ে আছি, সেই তারকেশ্বরের বাড়ির কোনো গরমের রাতের মতো। ঘরে অন্ধকার, কিন্তু রাস্তার আলো কিছুটা ছিটকে আসছে, আর কিছুটা আকাশের আলো। আমি হঠাৎ বুঝতে পারি আমিও একা, আমার পরিবারের সঙ্গে যাতে সম্পর্ক না থাকে সেই ভাবেই আমার জীবনটা কেউ সাজিয়েছে। ওরা আমার কেউ নয়। মহাবিশ্বে মহাকাশে ঘুরতে ঘুরতে দৈবাৎ কিছু অ্যাস্টারয়েড কাছাকাছি এসে পড়েছিল এই মাত্র। নিক বলেছিল পরিবারে পরিবার থাকে না। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকে, খুঁজতে হয়, ভাগ্যে থাকলে পাবে।

মায়ের সাদা শাড়ি অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে। মা হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন, কেমন রহস্যের সুরে বললেন—আমি কিন্তু জানতুম। ভীষণ আর্ত গলায় গেয়ে উঠলেন—আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ'...

গানের রেশটুকু ফুরিয়ে যেতে দিই। বলি—কী মা, কী জানতে?

উনি আস্তে আস্তে বললেন—বোঝোনি না? আমি জানতুম তোমাকে কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না। আমিও না। আমি একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলুম খুকু, কেন না আমাকে বাঁধা হয়েছিল, আমি রুখতে পারি নি।

মনের ভেতরে কথারা বিজবিজ করছে, কিন্তু সে সব কথা আমি বাইরে আসতে দিই না।

—কেন পারোনি মা? খুব আস্তে প্রশ্ন রাখি। আজ যদি ইনি মন খুলেছেনই, ধরা যাক ইনি নিজের সঙ্গেই কথা বলতে চাইছেন, আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

খুব অপ্রত্যাশিতভাবে উনি ফিসফিস করে বললেন—আমি যে ভালোবেসে ফেলেছিলুম। উনি আমার কাছে তখন অলৌকিক ব্যক্তি ছিলেন। কী জ্ঞানের পরিধি! কী পারঙ্গমতা! আমার ভক্তিশ্রদ্ধার সুযোগ উনি অমনি ভাবে আচমকা নেবেন আমি কি ভাবতে পেরেছিলুম!

—উনি কি তোমাকে পড়াতেন?

—হ্যাঁ।

—সুযোগ নেবার পরেও তোমার শ্রদ্ধা গেল না? সন্তর্পণে বলি।

—উনি যে শিল্পী ছিলেন মা, সাধারণ একজন লুব্ধ নাগর তো ছিলেন না! আমাকে নিয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এলেন। আমার তো এক কাকা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তাঁর খুব সুবিধেই হয়ে গেল। আমার ভাগের সম্পত্তিটা আর দিতে হল না। কিন্তু খুকু, কোথায় আমার সেই স্বপ্ন-দাম্পত্য? লাল হল, বিল হল, নীল হল। আমি আর নিজের কাজ কিছুই করতে পারি না। বাইরের পৃথিবী আমায় ডাকে। ইচ্ছে ছিল শেষ পর্যন্ত শিখব, ডিপ্লোম্যাট হব, কাজটা আমার খুব সোজা, খুব পছন্দের মনে হতো। ওটাই আমার স্বধর্ম। উনি যেই বুঝলেন এইরকম কিছু একটা আমার মাথায় আছে আমাকে একটার পর একটা সন্তান দিয়ে আটকে দিতে লাগলেন। ফুল হল, দুল হল। খালি কাঁথা ন্যাতা, বুকের দুধ, রাত জাগো, বাচ্চা কাঁধে করে ঘোরো, শেষে আমি দেখেশুনে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যৌবনবতী মেয়েকে এনে ওঁকে উপহার দিলুম—এবার থেকে এ-ই তোমার সেবা করবে।

—এইটা তুমি করলে? পারলে?—আমি পাথর হয়ে জিজ্ঞেস করি।

—করলুম। খুকু, তোমার কি ঘৃণা হচ্ছে? আমি নাচার মা। ভালোবাসার মানে আমার কাছে *অন্যরকম* ছিল।

—বাবা মানলেন?

—খুব লম্ফঝম্প করেছিলেন প্রথমটায়। আসলে ওঁর চাহিদা খুব বেশি ছিল। স্ত্রী স্বয়ং দিচ্ছে অন্য কেউ জানতে পারছে না, মা হাসলেন—খুকু তুমি

হয় তো জানবার সুযোগ পাও নি, পুরুষরা নতুন সঙ্গী পেলে বেশ পুলকিত হয়, স্তরভেদেও কিছু আসে যায় না। অত মানসিক মিল, ভালোবাসা এ সবের ধার ওরা ধারে না। কিন্তু তাতেই বা উনি তৃপ্ত হতে পারলেন কই? তাই অবশেষে ভুল, এবং তুমি। ব্যাস, আমার আর ক্ষমতা রইল না, উনি আমার কাছে হেরে গেলেন।

খুকু রাগ করো না, আমি একটি সন্তানকেও মেনে নিতে পারি নি, কোনো যত্ন নিই নি। পরমা যেটুকু করেছে, লোকজনও বাচ্চা একটু বড় হলেই আমি ছাড়িয়ে দিতুম। আমার একার দায়িত্বে তো কেউ জন্মায়নি! যাঁর আসল দায়, তিনি দেখুন। কাঁথা পাল্টান, কোলে নিয়ে ঘুরুন, রাত জাগুন, দুধ খাওয়ান, খেলা দিন। নিজে আরামচেয়ারে বসে পড়াশোনা করবেন, আর বক্তৃতা দিয়ে লোক মজাবেন, আর আমি এত ক্ষমতা নিয়ে, ইচ্ছে নিয়ে ন্যাতাক্যাঁতা হয়ে থাকবো এ তো হয় না! এদিকে তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল আমার নিশ্চয় অন্য কারও কারও সঙ্গে সম্পর্ক আছে। কোনও কোনও সন্তান ওঁর নয়। তাই উনিও তাদের পুরোপুরি মেনে নিতে পারতেন না।

—উনি কি একেবারেই ভুল ভাবতেন? বলবোনা ভেবেও বলে ফেললুম।

মা আমার দিকে তাকালেন, চোখে কৌতুক বললেন—এর উত্তর আমি দেব কেন? তুমি নিজে নিজের ভেতর থেকে সে উত্তর খুঁজে বার করো। তবে লাল আর বিল ছাড়া ওঁর মতো কেউ না। নীল আলাদা, দুল আলাদা, ফুলের সঙ্গে আমার চেহারার খুব মিল, তুমি যত বড় হলে আমার মতো ধরনধারণ হয়ে যেতে লাগলো। ভুল বেচারি তো একেবারেই ভুল। খুকু কিছু মনে করো না, আমি একটি সন্তানকেও পালন করিনি, ভালোবাসিনি, যে ভাবে মায়েরা বাসে। আমি না বললেও তোমাদের এ সন্দেহ নিশ্চয় হয়েছে। সন্দেহটা ঠিক। আর কী জানো? বড় হয়ে যেই কোনো ছেলে বিশেষ হবার সম্ভাবনা দেখাতো, আমার তার ওপর সাংঘাতিক হিংসে হতো। তখন ঠিক বুঝতে পারতুম না। কিন্তু সম্ভবত এই কারণেই আমি নীলকে সহ্য করতে পারতুম না।

বুদ্ধিমান ছেলে. দূরে চলে গেল। থেমে থেমে এত কথা বলে মা চুপ করে গেলেন।

আমি স্তব্ধ হয়ে শুনছিলুম, একটু পরে বললুম—মা তোমার মাতৃস্নেহ না

থাক, সৎসাহস আছে সত্য স্বীকার করবার। উনি বোধহয় শুনতেই পেলেন না। বললেন—ফুলকে দিয়েও তো আমার আশা মিটলো না। এখন বুঝি নীল আর তুমি আমার দুই কালো ছেলেমেয়ে আমার কিছু পেয়েছিলে। শত্রুবৎ দেখেছি নীলকে। তবে তোমার বেলায় আমার এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে। সব রকম সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও ফুলটা গেঁজে গেল। তোমাকে আমি নিষ্ঠুরের মতোই ঠেলে দিয়েছি স্রোতে। দেখো আমি ঠিকই বুঝেছিলুম। তুমি, তুমিই শেষ পর্যন্ত পারলে।

পারা বলতে উনি কী বোঝাচ্ছেন?—কী পেরেছি মা?

সে কী? কী পারোনি খুকু? পরিস্থিতিকে তুমি বরাবর অগ্রাহ্য করে গেছো। কোনও কিছুর জন্যে বসে থাকোনি তো মা! তোমার লেখাপড়া একটার পর একটা জীবিকা টিকে থাকবার জন্যে, সব পার করে নিজের কাজটা চিনতে পারা, সেই কাজের মধ্যে সসম্মানে থাকা—এ সব তো নতুন, একেবারে নতুন জিনিস! কটা মানুষ ভাবতে পারে এ ভাবে? একটা ভুল মানুষকে জীবন থেকে ঠেলে সরিয়ে দেবার জন্য তুমি কী কষ্টটাই না করলে! তারও পরে, তুমি মাতৃস্নেহে মানুষ করতে পারলে তোমার ওই সাহেবজাত ছেলেকে। খুকু এখানে তোমার আমার ওপর জিত।

আমি আস্তে বলি—তুমি তো আমাকে আবার সাত বাঁও জলে ফেলে দিলে।

—আমি? কী করে?

—ও যদি আমার মানুষ করা ছেলে হয় ওই বাবার টাকা ও নেবে কেন? অত টাকা হাতে পেয়ে ও যদি বিপথে চলে যায় এবার তো আমি তোমাকেই দায়ী করব। এ তো দেখছি তোমার সাহেব আমাকেও ব্ল্যাকমেল করছে মৃত্যুর ওপার থেকে।

—কিন্তু ও তো টাকা পঁচিশ বছরের আগে হাতে পাবে না মা! একটা ট্রাস্ট ওর ব্যয় কনট্রোল করবে তার পরেও। এ গুলো হয়তো তুমি জানো না। আর দেখো, সাহেব এবং তার টাকা!—মা হাসলেন আবছা—সাহেবের মতো লোকের টাকা ছাড়া আর কী আছে দেবার? ও তো শুধু নিয়ে গেছে। কিছু না কিছু তো ওকে দিতেই হবে বদলে? টাকাই ওর প্রাণ, আর ওই টাকার মধ্যে অন্তত অর্ধেক গোঁসাইবাড়ির টাকা জেনো, এনতার ঝেড়েছে।

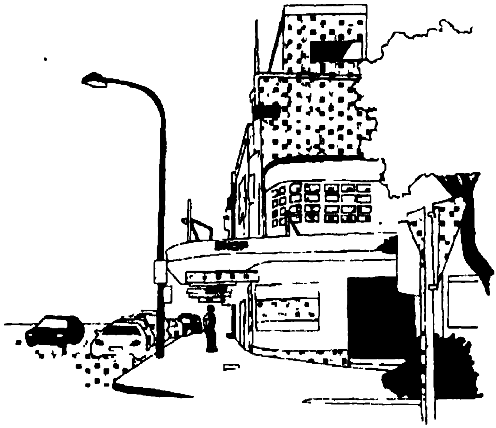
ও এমন কিছু একটা উকিল নয় যে এরই মধ্যে মফস্‌সলের আদালতে প্র্যাকটিস করে অত টাকা করবে। তুমি ছেড়ে চলে যাবার পর ওর ধান্দা ছিল আমাকে ফতুর করে দেওয়া। আমি তখন অনেক শিখে নিয়েছি তাই পারেনি, কিন্তু নিয়েছে এনতার। তোমার বাবার টাকা ঘুরপথে তোমার কাছেই ফিরে এল।

—ভুল বোঝাবার চেষ্টা করো না মা, তোমাকে সাহেব ফতুর করার কথা কখনো ভাববে না, আমার স্বরে দৃঢ়তা, একটু কি কঠোরতাও এসে যায়? তুমি ছিলে সাহেবের একমাত্র প্রেম।

মা আমার দিকে চেয়ে রইলেন একটু যেন অবাক, বললেন—তুমি ওর অবসেশনটার কথা বুঝতে পেরেছিলে তা হলে? আমারই ভুল, বুঝবে তো বটেই। তবে জেনে রেখো খুকু প্রেম ট্রেম নয়, লোকটা বিকারগ্রস্ত। ওর বাবা ছিলেন বিশুদ্ধ প্রেমিক। যা পাওয়া যায় না তা কখনো চাইবার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। ও একটা মূর্খ, ভণ্ড। ও আমাকেও চেয়েছিল, তোমাকেও চেয়েছিল। না পেয়ে ক্রমাগত টাকা চাইতে লাগল। খুকু, একটা কথা জেনো, লোকে আমার প্রতি আকৃষ্ট হতো, কিন্তু নারায়ণ গোস্বামীর মতো প্রেমিক পাওয়ার পর আর কারোকে কি আমার মনে ধরতে পারে? তবে হ্যাঁ, আমি বর্ন ডিপ্লোম্যাট, রাজবাড়ির দেওয়ানের রক্ত আমার শরীরে। যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন, হাতে কলমে শিখিয়াছিলেন আমাকে। তোমরা আজকে যাকে ম্যানেজমেন্ট বলো, তার মূলসূত্রগুলো আমার কবে থেকেই জানা। আমি এই ভক্তিগুলোকে ব্যবহার করেছি। হ্যাঁ, সাহেবকেও।

একটু থেমে বললেন—টাকাগুলো সব তোমার পিতৃধন, তোমার মাতৃধন, তুমি তার সদ্ব্যবহার করো।

আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকি পাশাপাশি, দেখি মায়ের একটা হাত আমার গায়ে, মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি ওঁর গায়ে বালাপোশ টেনে দিই ভালো করে, তারপর নিজেও চোখ বুজি, এবং কী আশ্চর্য ঘুমিয়েও পড়ি।



এখন আদুড় সকাল। আমার ঘরের মধ্যে রোদ লুটোপুটি খাচ্ছে। ঘুম ভেঙে দেখি মায়ের চান সারা, সাদা কালো চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়ানো, পেছন দিকে চুল কমে এসেছে, কিন্তু সামনে দিকে এখনো বেশ ঘন, শ্যাম্পুর সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। ইস্ত্রি করা নীল পাড়ের ছোট ছোট দাঁত দেওয়া শাড়ি সাধারণ করে নিখুঁত পরেছেন। গলায় একটা লম্বা সোনার হার, তাতে ছোট ছোট রুদ্রাক্ষ আর বেদানার দানার মতো পাথর গাঁথা। হারটা কোন সুদূর কাল থেকে এসে আমায় ধাক্কা দিল। তখন বাবা বেঁচে ছিলেন। হারটা দুলতো যখন উনি আমার বুকে দাগা দিয়ে বেরিয়ে চলে যেতেন, কিংবা ফিরেও, আমার দিকে তাকাতেন না, কী এক ভাবে মগ্ন হয়ে মহর্ষির ঘরের দিকে চলে যেতেন।

আমিও তাড়াতাড়ি চান সারি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই এসে যাবে। সময় দিয়েছি—দশটা। কবিতা এসে গেছে, জানান দিল। ওকে সবাইকার ভাত বসাতে বলি। ভাত, ডাল আর দু ফ্লাস্ক ভর্তি চা করে রেখে ও চলে যাবে। আমাদের পারিবারিক কথাবার্তার মধ্যে এরা থাকুক আমি চাই না। বাকি খাবার আসবে 'রান্নাঘর' থেকে।

সবচেয়ে আগে এল নীলদা। দরজাটা খুলেই রেখে ছিলুম। কতবার বেল বাজবে আর খুলব?

নীলদা দাঁড়িয়ে, ওর চোখ চকচক করছে। কী যেন ঝরছে ওর চোখের

তারা দিয়ে। ও যেন বলতে চাইছে, বাপে-তাড়ানো না হই, মায়ে-খেদানো আমরা দুই ভাইবোন, আমরা দুজনে দুজনের। ও সব বিশ্বেশ্বরী-টরি শেষ পর্যন্ত কিছু না।

কেমন এক আলোকিত হিংসুটির মতো আমি ওর হাত চেপে ধরি—নীলদা! দু জনে দুজনের চোখের দিকে নতুন এক বোঝাপড়া নিয়ে তাকাই।

—কালের দুই হাতে মন্দিরা কি এখনো বাজছে? বলতে বলতে নীলদা ঢুকল। আর মা কৌচ থেকে উঠে সোজা গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কপালে চুমু খেলেন, যে ভাবে মায়েরা খান। নীলদা নিচু হয়ে প্রণাম করল। তারপর হাসিমুখে মার দিকে তাকিয়ে বলল—হঠাৎ যে? মতলবখানা কী?

—তুমি চিনতে চেয়েছিলে তাই চেনাচ্ছি বাবা, মা হাসিতে মুখ ভাসিয়ে বললেন। তখন আমার হুঁশ হলো নীলদার সেই গান—তুমি না চেনালে পরে/কে তোমারে চিনতে পারে—ওটা মায়ের উদ্দেশেই গাওয়া ছিল। কে জানে নীলদার কালীসাধনা কেমন ভাবে কাজ করেছে সব কিছুর ভেতর থেকে!

মা নীলদার সঙ্গে কথা বলছেন, ঢুকল ফুলদি আর বিজনদা হাত জোড় করে বললেন—আমি শুধু সেথো ছোটগিন্নি, তোমাদের কথাবার্তা শুরু হলেই অন্য জায়গায় গিয়ে টিভি দেখব। দেখি ছোটগিন্নি কেমনটি হয়েছ?

এই ফুল জামাইবাবুই একমাত্র যিনি আমার দুর্দশার মধ্যে এসেছিলেন, টাকাপয়সা দিতে চেয়েছিলেন। যদিও আমার দরকার নেই বলে ওঁকে ফিরিয়ে দিই।

—বা বা বা, উনি বললেন—পূর্ণ যৌবন একেই বলে। লাবণ্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের মিশেল, বলুন মা?

মা বললেন—ওই তো মুশকিল বিজন, নিজেরটি কেউ দেখতে পায় না।

বিজনদা প্রায় রে রে করে উঠলেন—ওরে বাবা, দেখেছি মা দেখেছি। সেটিও তাই। সেটিও তাই।

ফুল একবার বাঁকা চোখে বিজনদার দিকে চাইল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল—আর সব কই রে খুকু? দশটা তো প্রায় বাজল!

হুড়মুড় করে বাকিরা এসে গেল, একে একে। প্রথমে চয়ন, জারিন, আমি জারিনকে আলাদা করে আসতে বলেছিলুম। ও এসে মাকে প্রণাম করে দু হাত

জড়ো করে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। মা ওকে চুমো খেলেন, এত চুমো খেতে মাকে আমি কোনদিন দেখিনি। বললুম বাবুই আছে, ওর ঘরে যা।

তারপরে এল টুকাই, সব শেষে লালদা আর বিলদি, সঙ্গে অবশ্যই বউদি। টিউমার অপারেশন হয়েছে, এবং আবার গজাচ্ছে। নিউরো-সাইক্লোমেটেসিস, ওদের নির্মূল করা যায় না। দুলদা ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অধিবেশন আরম্ভ হল।

লালমাধব গোস্বামী বললেন—খুকু কী ঠিক করলে বলো। নানারকম কায়দা করে তো পুরো সম্পত্তিটি নিজের নামে গুটিয়ে এনেছ। তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরকম ছিল। তোমার বউদি অনেক কিছু বলেছে, আমি কিছুই বিশ্বাস করিনি। এখন দেখছি ও-ই ঠিক।

আমি সকলকে চা ঢেলে দিচ্ছিলুম, ফুল এসে আমার হাত থেকে ট্রেটা নিল। বলল—সবাই তুলে নাও।

—পুরো সম্পত্তিটা আমি জট ছাড়িয়ে টাকায় কনভার্ট করেছি, আমি বলি, —এখন নানান জায়গা থেকে এইসব বিক্রিবাটার দলিল আর নগদ টাকা যা এখন ব্যাংকে জমা আছে, সবটা আমি মাকে দিচ্ছি। —মায়ের কোলে আমি একটা ফাইল রাখি। একটাই কথা আছে আমার, লোভ আমি বরদাস্ত করতে পারি না।—কথাটা বললুম টুকাইয়ের দিকে চেয়ে। ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, ওর চালাকি যে আমি ধরতে পেরে গেছি ও ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। মা যে বলেছিলেন আমি দানপত্র করেছি, কিন্তু সব করেছি বলে আমার মনে পড়ছে না, সেইটুকুর ওপর ভরসা করে আমি হস্তলিপিবিশারদের কাছে গিয়েছি, জেনেছি দানপত্রের মধ্যে একাধিক বিষয়ের উল্লেখে হাতের লেখা সত্যিই জাল। তবে এ কথা আমি কারো কাছে খুলে বলছি না। অন্যরাই বা কম কীসে?

সবাই চুপ। একেবারে চুপ। এটা বোধহয় কেউ আন্দাজ করতে পারেনি।

মা ছোট্ট গলায় বললেন—এ রকম তো কথা ছিল না খুকু। আমি যা বুঝেছিলুম করে সেরেছিলুম, এখন আবার নতুন করে ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব? পাশ বইগুলো দেখে মা বললেন—এ তো দেখছি ও প্রায় দু কোটি টাকার ক্যাশ রেখেছে। তোমার উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করো এর ট্যাক্সটা

যেন ওকে দিতে না হয়। বেশ কিছুক্ষণ শুধু চা পান করার আওয়াজ। মা হঠাৎ খোলা গলায় গান ধরলেন—'আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে।' পুরো গানটা শেষ করে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ, কেমন একটা খেদের গলায় বললেন—নিতান্তই নেবে তা হলে তোমরা? আমার বিচারে তোমরা কিছু পাও না। কেউ তাঁর জন্যে কিচ্ছু করোনি, এই সম্পত্তি রাখবার জন্যে যা যা দরকার তা-ও বলতে গেলে আমি একা করেছি, এই মেয়েটা তখন ছোট, ও যেটুকু সাহায্য করেছে, টুকাই দেখেছে আমাকে, সংসারের জন্যেও তোমরা কিচ্ছু করোনি, তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক, তা-ও কি রেখেছিলে? নিজেরটুকু ছাড়া কোনোদিন কিছু ভাবোনি।

ঠিক আছে, খুকু যখন চাইছে—আমার ছয় ছেলে মেয়ে আর এক অনাথ নাতি মিলে সাতজন হয়, সাতটা সমান ভাগ হোক, বিল তোমাকে আমি বাদ দিচ্ছি, তোমার শাশুড়ি-মা বারবার করে বারণ করেছেন, সেই অংশটা আমি চকাইকে দিচ্ছি, কেন না তোমাদের মধ্যে খুকু ছাড়া একমাত্র চকাইই একটা অন্যরকম কিছু ভালো, প্রোগ্রেসিভ কিছু করবার সাহস দেখিয়েছে।

আমি বললুম—আমার অংশটা আমি তোমাকে দিচ্ছি মা, যেখানেই থাকো, নিজের টাকায় ভালো করে থাকো। কেন যে এখনই এ সব দান-টানের মধ্যে গেলে তা-ও আমি বুঝি না।

মা কেমন একটা মেজাজি হাসি হেসে বললেন—বুঝতে পারোনি, না? এদের চেহারাগুলো পরিষ্কার দেখতে দেখাতে চেয়েছিলুম খুকু, তোমাকেও তো পরিপূর্ণ চিনিনি, তা-ও যে বাকি ছিল! আর শোনো আমার স্বাচ্ছন্দ্যের কথাও তুমি, একমাত্র তুমিই ভাবলে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, আমি কিন্তু এখন থেকে আর কোনো স্বার্থের ঘর করব না। শেষ দিনগুলো তোমার কাছেই থাকি, এই আমার ইচ্ছে।

চয়ন এই সময়ে তার কিশোর-কিশোর গলায় বলে উঠল—আমার একটা কথা আছে। ওর মুখটা বিমর্ষ।

—কী?

—দিদাই আমার যে কাজটার জন্যে পুরস্কার দিচ্ছিলেন, সেটা মানে সে কাজটা আর থাকছে না, মানে—আমি জারিনকে বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু জারিন এখন আর আমার সঙ্গে থাকতে চাইছে না। কাজটাই যখন টিকল

না, টাকাটা আমি ডিজার্ভ করি না।

চয়ন একলাফে উঠে কেউ কিছু বলবার আগেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। লিফটের গেট বন্ধ হবার আওয়াজ পেলুম। সব চুপ। দেখি, ফুলদির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এই তো চেয়েছিলি ফুল, তাহলে এমন মুখ কেন আজ! কী চেয়েছিলি তা হলে?

নীলদার নরম ব্যারিটোনে স্তব্ধতা ভাঙছে—মাতাঠাকুরানি, সবই তো যথাযথ করলেন, একজনকার কথা ভুললেন কী করে? ভুল? ভুল কি সবটাই ভুল ছিল মা? তাকে কাঁধে চড়িয়ে কত ঘোরা ঘুরেছি পুজোর সময়ে, গাজনে, মনসাভাসানে, তাকে না হয় আমি আমারটা দিই? চয়ন বাহাদুর ছেলে সে তারটা ফিরিয়ে দিয়েছে, এই দুটো ভাগ নিয়ে বরং আমরা ভুলভৈরবের মতো কাউকে—পুরো গোস্বামী পরিবার এখন চুপ। সুহাসিনী মুখ নিচু করে রয়েছেন।



একদম ভোর রাতে বাবুইয়ের ফ্লাইট ছিল। রাতে ওকে ছেড়ে দিয়ে এসেছি এয়ারপোর্টে। নিউ ইয়র্কে নিক ওকে রিসিভ করে নেবে। যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়ে ও এখন আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার জন্যে প্রস্তুত। বাবুই জানে না, কিন্তু আমি টের পাই নিকের কথা সত্যি। ও আর আমার কাছে ফিরবে না।

বাবুই নেই, আমার কাছে বাবুই নেই। নীলমাধব? কী জানি কোন নির্জনতায়, কীসের সন্ধানে সে ঘুরছে। হয় তো মাঝে মাঝে আসবে, হয় তো আসবে না। জানি না, শুধু সমস্ত বিরহ গিলে নিই। আচ্ছন্ন কোরো না, আমাকে আচ্ছন্ন কোরো না হে! এখন ঘন শীত! আমরা তিনজন এখন এখানে। মাত্রই তিনজন। তারায় ভরা রাত। আমরা সেই তারাভরা আকাশের দিকে উর্ধ্বমুখ। কত না আলোকবর্ষ পার হয়ে আমাদের স্পর্শ করতে আসছে ওরা। এখন হয়তো আর নেই, পুড়ে শেষ হয়ে অনন্তে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু যতক্ষণ ছিল জ্বলজ্বলে হয়ে বেঁচেছে। এখনও যখন আমাদের চোখে বেঁচে আছে, তখন নিশ্চয় একরকম করে বেঁচেই আছে। কে বলবে সেই বেঁচে থাকার মানে কী? বিজ্ঞান হয়তো কোনওদিন আয়ুর অন্য কোনও সংজ্ঞা বার করবে। এখন সকলই গুহায় নিহিত। এক আশ্চর্য আবিষ্কারের নিরুদ্ধ আবেগে

আপাতত আমরা ঊর্ধ্বমুখ। অশীতিপর এক যুবতী যিনি লাগাম আর জিনের দিক থেকে ক্লান্তিহীন মুখ ফিরিয়ে গেছেন, কিন্তু মুক্তি পাননি, ঊনচল্লিশ বছরের তাঁর মেয়ে যে ছিঁড়ে ফেলেছে লাগাম, মুখ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে তবু পরেনি, ছুড়ে ফেলে দিয়েছে জিন রেকাব লেজের এক একটা ঝাপটায়, আর মধ্য বিশের আমার এই কন্যা যে লাগাম দেখবামাত্র তাকে চিনতে পেরেছে। আমি তার বাঁকানো গ্রীবার ওপর হরষিত রোমরাজি দেখতে পাচ্ছি। এত এতকাল পরে আমার পরিবার পূর্ণ হল। তীব্র হ্রেষা শুনতে পাই। এখন গভীর রাত। কোথায় চিল? কোথায়? এ সেই আসল অশ্বিনীর আকাশ ভরা হ্রেষা। সে ছুটছে, তীব্র নীল জিজীবিষায় ছুটে যাচ্ছে অরণ্যের পর অরণ্য নক্ষত্রের পর নক্ষত্র, আরও ছায়াপথ আরও নীহারিকার রুপোলি নির্জন, দশ দিকে দিঙ্‌নাগেদের উদ্ধত তর্জন বিশাল বিশাল লাফে পার হয়ে...ছুটছে।